রহমান খাঁর দুর্গোৎসব

শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশক—

শ্রীজ্ঞানদাচরণ দাস

বিনোদিনী সাহিত্য-মন্দির
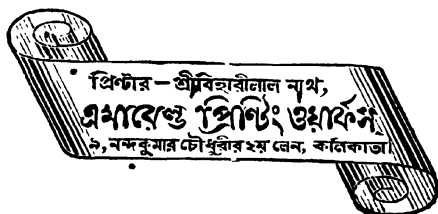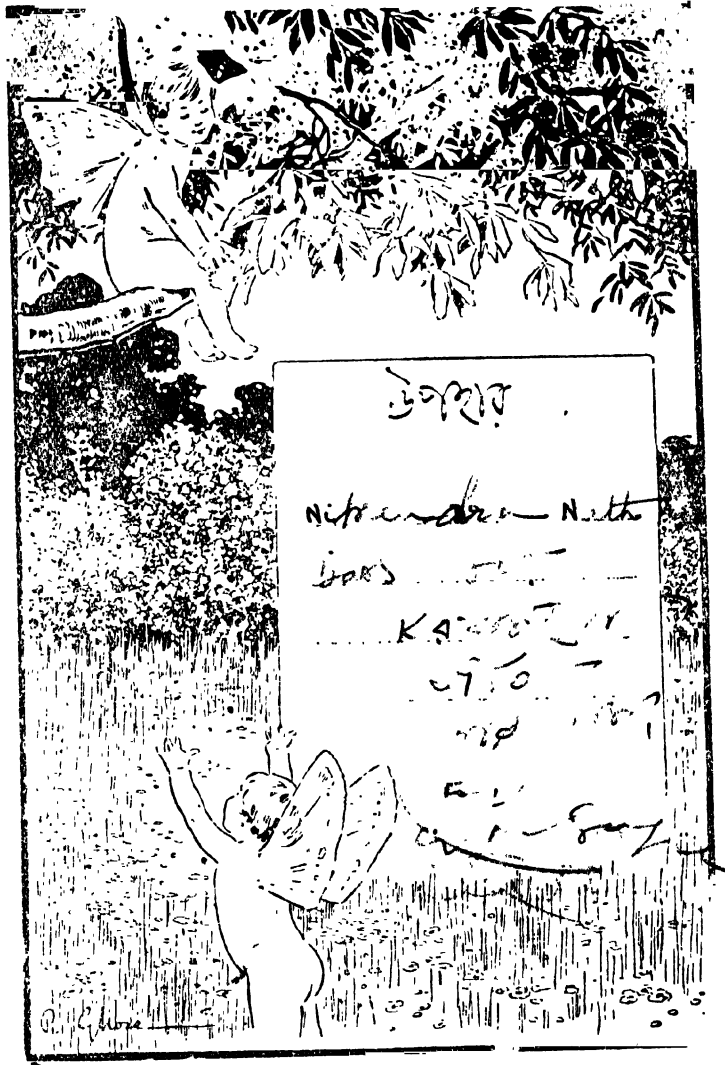
১১ নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন

সিমলা—কলিকাতা

উৎসর্গ

দক্ষিণেশ্বরনিবাসী সাহিত্যপ্রাণ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু—

জন্মাষ্টমী ১৩২৮

কাশীধাম।

রহমানখাঁর দুর্গোৎসব

১

দুর্গা-পূজার ষষ্ঠী। কলিকাতা সহরে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। পোষাকের দোকান, মনোহারী দোকান, জুতার দোকান আজ সবগুলিই মহা-সমারোহে সুসজ্জিত।

বিকাল ৫টা। এমন সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ পোষাক-বিক্রেতা সেন-ফ্রেণ্ডের দোকান-সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। গাড়ীর মধ্য হইতে কলিকাতার বিখ্যাত পাটের দালাল বিজয়বাবু ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নামিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ফ্রক্‌, জ্যাকেট্‌, লকেট্‌, ক্রাউন, বেল্ট, বনেট্‌ ইত্যাদি একরাশ পোষাক পরিচ্ছদে গাড়ী বোঝাই করিয়া তিনি ছেলেদের লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

—রহমানখাঁর দুর্গোৎসব—

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। বালকেরা সকলেই নিজের নিজের পূজার পোষাক অন্যকে দেখাইয়া আনন্দ পাইতেছিল। সেই সময় কোথা হইতে চার বছরের একটী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে একমুখ হাসি লইয়া বিজয়বাবুর দিকে চাহিয়া আধ আধ ভাষায় বলিল, "দাদা আমাল কাপল ?"

মেয়েটী বিজয়বাবুর বড় কাকার, নাম উমা। পতিহীনা উমার মা এ সংসারে আজ দু'বছরের উপরে আসিয়াছে। সংসারের সব কাজগুলির দায়িত্ব আপনার ঘাড়ের উপর লইয়াও বেচারীর এমন একটা দিনও যাইত না, সে দিন বাড়ীর বৌদের মুখনাড়ার সৌভাগ্য লাভ না করিয়া অন্ন মুখে উঠে। এতখানি অনাদর বুকে চাপিয়াও সে কেবল কন্যার মুখ চাহিয়াই নীরবে সমস্ত সহ্য করিত। কিন্তু এতখানি সহের বাধও ভাঙ্গিয়া যাইত যখন চক্ষে পড়িত, বাড়ীর ছেলেরা এই চার বছরের ছোট জীবটার সম্মুখে, নাচিয়া কুঁদিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া খাবার খাইত, চাহিতে গেলে চড় মারিয়া এক টুকরা ভাঙ্গিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিত, তখন বিধবার অশ্রু আর বাধা মানিতে চাহিত না। তবুও তাহাকে এমনই করিয়া এই সংসারে কাটাইতে হইতেছে।

সেই হতভাগীর কন্যা যখন বিজয়বাবুর কাছে 'দাদা আমাল কাপল' বলিয়া আব্দার ধরিল, তখন বিজয়বাবুর চক্ষুর তারকা দুইটা

এমনই করিয়া ঘুরিয়া উঠিল যে, বালিকা সভয়ে ও সরোদনে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

বাহিরের বারাণ্ডা হইতে বিজয়বাবুর সহিত রহমানখাঁ, ঘটনাটী লক্ষ্য করিয়াছিল। সে বালিকার কাছটাতে আসিয়া তাহার কোঁকড়ান থোকা থোকা চুলগুলি নাড়িয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বেটী কাঁদ্‌ছিস ক্যান ?"

বালিকা ছল ছল চক্ষে ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া বলিল, "আমাল ত' এই কাপল আছে, মা কেচে দিলেই ফলসা হবে।" রহমান এ পরিবারের অনেক খবর রাখিত, সেই জন্য বেশী কিছু জানিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না, তাহার কঠিন প্রাণ স্নেহে কোমল হইয়া গেল। উমাকে কোলে তুলিয়া বলিল, "চল বেটী কাপড় লবি চল।"

২

রহমানের একমাত্র কন্যা দরিয়া আট মাস হইল, তাহাকে সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া 'খোদার পাশ' চলিয়া গিয়াছে। আজ উমাকে কোলে করিয়া দরিয়ার কথা মনে পড়িল। উমার মধ্যে যেন সে দরিয়াকে পাইল। রহমান উমাকে লইয়া একটা ছোটখাট পোষাকের দোকানে আসিল।

একটা যুবক দোকানে বসিয়া কেনাবেচা করিতেছিল। উমাকে দোকানের একপাশে বসাইয়া কোমর হইতে কুড়িটা টাকা বাহির করিয়া রহমান বলিল, "বাবুজী এই আমার পুঁজি, এতে যদি হয় তো এই মেয়েটাকে আপনার মনের মত ক'রে সাজায়ে দেন।"

যুবক মেয়েটার প্রতি একবার তাকাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বালিকাকে যেমনটা সাজাইলে মানায় তেম্‌নি করিয়া সাজাইয়া দিল। রহমান মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল দোকান আলো করিয়া সত্যই যেন উমা আসিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। সে কাতর কণ্ঠে ছল ছল চক্ষে বলিল, "বাবুজী এটা যেন আর উত্তরে নেবেন না, আমি বড় গরীব—আপনার নোকরি ক'রে বাকি টাকা শোধ দিমু।" রহমানের মনে হইল এমন পরিচ্ছদ বঝি এই কয়টী টাকায় হইয়া উঠিতে পারে না।

দোকানী যবকটী কিন্তু সেই টাকা হইতে মাত্র বারটী টাকা তুলিয়া লইল দেখিয়া রহমান অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবুজী খোদা আপনার আচ্ছা করবেন। খোদা আপনাকে বহুৎ দেবেন।"

আজ সে মৃত-কন্যার কথা একেবারে ভুলিয়া গেল, উমাকে কোলে পাইয়া আজ সে সব যাতনা ভুলিল। যে দুঃসহ শোকের যাতনা ভুলিবার জন্য এতদিন রহমান সরাপের আশ্রয় লইয়াছিল, আজ তাহা হইতেও উগ্র নেশার জিনিষ সে পাইয়াছে। রহমান বার বার উমাকে কোলে চাপিয়া ধরিতেছিল। উমা আনন্দে ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া বেড়াইয়া বাড়ীর সকলকে তার কাপড় দেখাইতে লাগিল।

এত সব কে দিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বালিকা বলিল, "লমানদা আমাল কাপল দিয়েছে।"

বিজয়বাবর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, উমার মা প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু তখনকার মত সব চুপ চাপ রহিয়া গেল।

৩

বিজয়ার প্রভাত। বিজয়বাবু এইমাত্র চা পান শেষ করিয়া বাহিরে যাইতে যেমন ফটকের নিকট আসিয়াছেন, সম্মুখে পড়িয়া গেল রহমান। এ কয়টা দিন বিজয়বাবু রাগে টক্‌টকে হইয়া থাকিলেও সে রাগের রংটা কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। তাহার মসীকৃষ্ণ বর্ণই সেটাকে চাপা দিয়াছিল। কিন্তু আজ রহমানকে সম্মুখে দেখিয়া হিংস্র জন্তুর মত দাঁত খিঁচাইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিকাল যাও, আজ সে জবাব।"

রহমান বলিল, "হুজুর কসুর মাপ করবেন, জবাব ষষ্ঠী হ'তেই নিয়েছি, পূজা মোর খতম হয়েছে, মার হাসি দেখেছি; মুসলমানে ভাসায় না, মোরা নিজেই ভাসি, বিসজ্জোন নিজেই নিতে এসেছি—নিলামও। কখনও খোদা যদি সত্যির হিন্দু মেলান, তেনার নোকরি ক'রব—নয় তো এই-ই খতম।" রহমান বিজয়বাবুকে সেলাম করিল।

গেটের বাহিরে উমা বালক-বালিকাদের সহিত খেলায় মগ্ন ছিল; রহমান ধীরে ধীরে যাইয়া তাহাকে গভীর স্নেহে কোলে তুলিয়া চুমা খাইয়া নীরবে বিদায় হইয়া গেল।

সুদে-আসলে

১

ডাক্তার কবিরাজ যখন সকলে এক বাক্যে প্রভাতবাবুর স্ত্রী বেদবতীকে বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিলেন, তখন অগত্যা প্রভাতবাবুকে কিছুদিনের জন্য আদালতের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কাশী আসিতে হইল।

বেদবতীর শরীরে অসুখ যতটা না ছিল, মনে তার তুলনায় তত বেশী পরিমাণে তিনি অসুখী ছিলেন। একটা মাত্র ছেলে, না পারে কথা বলিতে, না পায় শুনিতে। এই হাবা কালা ছেলেটাকে মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসার স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া, তিনি তাহাকেই জীবনের অবলম্বন করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

সংসারে মানুষ যে যে জিনিষগুলিকে সুখের উপাদান বলিয়া মনে করে, বেদবতীর তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। রূপবান্ গুণবান্

স্বামী, অগাধ সম্পত্তি, যথেষ্ট লোকবল, ইহার কোন একটী হইতে ভগবান্ তাঁহাকে বঞ্চিত করেন নাই। কিছু দিন পরে প্রকৃতি ধরা দিয়া জানাইয়া গেল ছেলেটী হাবা কালা। প্রভাতবাবু পুত্র সম্বন্ধে হতাশ হইয়া আদালতের কার্য্যে আরও অধিক মনোনিবেশ করিলেন ও স্ত্রী বেদবতী অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই অভাগা জীবটীর সেবায় আপনার সমস্ত সময় উৎসর্গ করিলেন। এমন করিয়া অনেক দিন কাটিল।

এখন অরুণকুমারের বয়স দশ বৎসর। ভগবান্ শুধু তাহাকে অদ্ভুত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহার প্রকৃতিগত কার্য্যগুলিও সৃষ্টিছাড়া ছিল। ভোর রাত্রে যখন পূব আকাশের কোলে হেলিয়া শুক তারাটি জ্বল জ্বল করিত, অরুণকুমার বিছানা হইতে নিঃশব্দে উঠিয়া, ছাদে গিয়া তাহার এক কোণে অন্ধকার প্রকৃতির সহিত একত্রে মিশিয়া, তাহার দৃষ্টিটুকু চারিদিকে বিস্ফারিত করিয়া যেন কিছু দেখিবার আকুল চেষ্টা করিত। সে যেন তাহার মূকতা ও বধিরতা-জনিত ক্ষতিটুকু, চক্ষু দিয়া, পূর্ণমাত্রায় পূরণ করিয়া লইবার প্রয়াস পাইত। পৃথিবী আলো করিয়া নানা গাছের ফাঁক দিয়া, অনেক অট্টালিকার মাথা এড়াইয়া, আলোর রেখাটি যখন নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া, জানালার বন্ধ কাঁচের ভিতর দিয়া বেদবতীর বিছানার উপর এলাইয়া পড়িত, তিনি ধড়্ মড়্ করিয়া জাগিয়া দেখিতেন, অরুণ কাছে নাই।

আজ যখন নিদ্রাভঙ্গে অরুণকে শয্যায় দেখিতে পাইলেন না, তখনই পূর্ব্ব অভ্যাসের বশে অবিলম্বে ছাদে গিয়া দেখিলেন, স্নেহের বাছাটী আজও তেমনি ধূলায় পড়িয়া আছে। নূতন রৌদ্রের খানিকটা রেখা আড় হইয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। তিনি আস্তে আস্তে আঁচলে গা মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। মাতার সুকোমল স্পর্শে, বালকের গভীর একাগ্রতা টুটিয়া গেল; সে একটা আকুল দৃষ্টি মা'র মুখের উপর ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল, মা'র চক্ষে অশ্রু জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। বালকের ব্যাকুলতা কেবল এই একমাত্র মাতার অশ্রুতেই বিকাশ পাইত। সুকোমল হাত দু'খানিতে মা'র কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "মা! তোমার চ'খে জল কেন? তুমি কাঁদছ কেন?" মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা এই একটা মাত্র দৃষ্টিতেই ঘুচিয়া গিয়া আনন্দে ভরিয়া যাইত এবং জননী তখন এই পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া মনে করিতেন।

অরুণকুমারের মনটা বাঁধা পড়িয়াছিল একমাত্র মাতা বেদবতীর কাছে। প্রাতঃকালে অরুণ জাগিয়া উঠিলে পর স্বহস্তে তাহার হাত মুখ ধোয়াইয়া সাজ গোজ করাইয়া, তাহার পর কিছু খাবার দিয়া যখন বেদবতী পূজায় বসিতেন, অরুণ অনন্যমনে মাতার পূজার প্রত্যেক কার্য্যটী লক্ষ্য করিত। অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্রে তাহারই মত মৌন একটা কুকুরছানাকে সঙ্গী করিয়া, সে যখন খেলায় মাতিয়া

থাকিত, সন্ধ্যার আবছায়ায়, কাহার কোমল হস্ত স্পর্শে আবার সচেতন হইয়া, ছুটিয়া মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চঞ্চল চক্ষুর দৃষ্টি, হস্তের স্পর্শ সমস্ত দ্বারা মাতাকে জানাইতে চাহিত, "এতক্ষণ কোথা ছিলি মা?" অরুণের সেই উজ্জ্বল চঞ্চল চক্ষু দু'টীতে হৃদয়ের সমস্ত ভাবটা যেন ভাসিয়া উঠিত। বেদবতী অরুণের হৃদয়ের সব স্থানটা সেই দু'টা চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখিতে পাইতেন।

আজ কতদিন হইল, এই একই নিয়মে অরুণের সকল ব্যবস্থা বেদবতী করিয়া আসিতেছেন। হঠাৎ সেই সকল ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিয়া বেদবতী অসুখে পড়িলেন। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া দিল। ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী ভরিয়া গেল। বালক অরুণ আকুল হইয়া পড়িল।

বেদবতী সেই অসুখের মধ্যেও বার বার স্বামীর মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, তাঁহার হাতখানি নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া, মিনতি ভরা বচনে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হ্যাঁগা! খোকার কোন অযত্ন হ'চ্ছে না তো? একটাবার ডাক না তাকে।"

প্রভাতবাবু একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না গো না! বাড়ীতে এতগুলো লোক রয়েছে; আর ওর জন্যে তো একটা ঝী-ই ঠিক ক'রে দিয়েছি, অযত্ন হবে কেন?"

"ওগো আর কেউ তো ওকে চেনে না, ওর সমস্ত খবরটুকু যে আমি ছাড়া আর কেউ রাখতে পারে না।" রোগিণীর শীর্ণ গণ্ডস্থল বাহিয়া দু' ফোঁটা তপ্ত অশ্রু বালিশের উপর পড়িল। তিনি যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, অরুণকুমার হয় তো কোথায় কোন ধূলার মধ্যে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, রৌদ্রে সমস্ত শরীর ভরিয়া গিয়াছে। আজ আর কেহ তাহার গা মুছাইয়া কোলে করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেয় নাই। ক্ষুধায় বোধ হয় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সে যে চাহিয়া খাইতে পারে না, কেহ খাইবার জন্য ডাকিলেও সে যে শুনিতে পায় না, ভগবান্‌ তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ দু'টা হইতে যে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার নিজের মতন কেহ কি তাহাকে কোলে করিয়া খাওয়াইয়া দিবে? এইরূপ কত কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কান্না গুমরাইয়া গুমরাইয়া উঠিত, স্বামীর হাতখানি ধরিয়া মিনতি-স্বরে কখন বা বলিতেন, "একবার আমার কাছে ডেকে দাও না তাকে।"

"তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, তখনি বলেছিলেম তোমায় দিই ওকে হাবা-কালাদের স্কুলে পাঠিয়ে, ওর নিজেরও ভাল হবে, আমাদেরও ভোগ কমবে, শুনলে না তো তুমি।"

"ওগো, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, ওর জন্যে আমার এক তিলমাত্রও কষ্ট নাই। দুঃখ এই জন্য যে ওর মুখের 'মা' ডাকটা

শুনলেম না। ও যদি একবার আমায় 'মা' ব'লে ডাকত, তা হ'লে আর আমার কোন সান্ত্বনারই প্রয়োজন হ'ত না।" বলিতে বলিতে বেদবতীর কণ্ঠস্বর কান্নায় রুদ্ধ হইয়া আসিত। হায়, এই 'মা' ডাকেই যে নারী-জীবনের সার্থকতা!

২

প্রভাতবাবুরা কাশীতে আসিয়াছেন সেই আশ্বিন মাসে। দেখিতে দেখিতে ফাল্গুন মাস যাইয়া চৈত্রের কোঠায় পা দিল। বেদবতীর শরীর এখন সুস্থ হইয়াছে, নষ্টস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছেন; তবে সেটা সেখানকার ডাক্তারদের ওষুধের গুণে কি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ দর্শনে, সেইটাই ভাবিবার বিষয়। কারণ, বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াও প্রভাতবাবু স্ত্রীর ওষুধের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান কম করেন নাই। বেদবতীকে যখন তখন সেটা শুনাইয়া বলিতেন, "দেখলে, বলেছিলুম না, ওষুধ না খেলে কি রোগ সারে, তা যতই বিশ্বনাথের না দোহাই পাড়, আর যতই না মানত কর।" বলিয়া তিনি একটু হাসিতেন। বাস্তবিক প্রভাতবাবুর চালচলনগুলি বিশেষ রকম সাহেবীয়ানা হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা মস্ত বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীতে সাহেব-সুবোর প্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত আগমন সদা সর্ব্বদাই ঘটিয়া পড়িত।

সেই সব চালচলন এখনও ঠিক তেমনি বজায় আছে। এমন সংসারে কিরূপে যে বেদবতীর বিবাহ হইল, সেটা লোকের চক্ষে একটু আশ্চর্য্য ঠেকিলেও বাস্তবিক সেটায় আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ ছিল না। এই পরিবারটীর বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহাদের অন্তঃপুরে এই সাহেবীয়ানার এতটুকু রশ্মি কখনও কোন ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই; বাহিরে বাহিরেই সেটা আত্ম-প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ, প্রভাত-বাবুর পিতামহী ছিলেন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা। তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহাদেরই মত একটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে। এইরূপ বিবাহে সংসারের অন্তঃপুরে কোন যে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে তাহার কিছুই নয়। বাহির ও অন্তঃপুরে যা কিছু পার্থক্য ছিল, তাহা কেবল আচার আচরণের মধ্যে।

আজ যখন স্বামীর ওষুধের উল্লেখে হাসিয়া আলমারীর এক পাশে স্তূপীকৃত একরাশ শিশি দেখাইয়া বেদবতী বলিলেন, "ওগুলোতে আমার শরীর যতটা না সারত, মা গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে, বাবা বিশ্বনাথের চন্নামৃত মাথায় ক'রে, আমার উপকার তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী হয়েছে।" তখন প্রভাতবাবু ইজি চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া খবরের কাগজখানায় মুখ ঢাকিয়া পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন।

সেটা চৈত্রমাস। গরমটা বেশ জাঁকজমকের সহিতই নিজের আগমন-সূচনাটা আরম্ভ করিয়াছিল। বিকালে অরুণকুমারকে

সাজাইয়া গোজাইয়া, বেদবতী তাহাকে খেলা করিবার ইঙ্গিত করিয়া কি কাজে চলিয়া গেলেন। অরুণকুমার ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাহার প্রিয় কুকুরটীকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়া, তাহাকে কোলের কাছে লইয়া, সদর দরজার ঠিক উপরে আসিয়া বসিল। কুকুরটী তাহার কোলে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া খেলা করিতে লাগিল। অরুণকুমার জামার পকেট হইতে খান কয়েক বিস্কুট্ লইয়া, নিজে হাতে করিয়া কুকুরটাকে খাওয়াইতে লাগিল। গোধূলি। অস্তোন্মুখীন সূর্য্যের শেষ রক্তাভা ধীরে ধীরে পৃথিবীর বক্ষ হইতে সরিয়া সরিয়া লুকাইতে চাহিতেছিল।

প্রভাতবাবুরা কাশীতে যে বাড়ীখানা ভাড়া লইয়াছিলেন, ঠিক তাহার পাশেই খানিকটা প'ড়ো জমী অনেক কালের কত জঞ্জাল বক্ষে লইয়া দরিদ্রার বোঝার মতই পড়িয়াছিল। তাহারই আশে পাশের বাড়ীর কতকগুলি বালক, অনবরত চারিটা রবিবার অক্লান্ত পরিশ্রমে, বৃদ্ধার বোঝা অপসারিত করিয়া দিয়া তাহাকে ভার-মুক্ত করিয়াছিল। প্রত্যহ বৈকালে সে জায়গাটা একটা তুমুল কোলাহলে ভরিয়া যাইত এবং তাহাদের সেই হা-ডু-ডু খেলার অপরূপ ভঙ্গী, কুস্তির মারপেঁচ্, দৌড়ানোর ধরণ, অরুণ একচিত্তে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিত। তাহারও ইচ্ছা হইত সেও অমনি তাহাদের একজন হইয়া এমনিভাবে ছুটাছুটি ক'রে খেলে।

-সুদে-আসলে—

মাঠের ছেলেগুলিকে বাড়ী যাইতে হইলে তাহাদের বাড়ীর ঠিক দরজার সম্মুখ দিয়া যাইতে হইত। মধু ছিল সে দলের সর্দ্দার। একদিন সে অরুণকে লক্ষ্য করিয়া অন্য সঙ্গীদের বলিল, "দেখ ভাই, ছেলেটী রোজ রোজ আমাদের খেলা দেখে, এবার থেকে ওকে খেলতে আসতে বলব, কি বলিস ?" সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন করিল, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, ছেলেটী তাহাদের প্রত্যেক কথায় শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না, তখন তাহারা তাহাকে পাগল স্থির করিয়া চলিয়া গেল। এক এক দিন তাহাদের মধ্যে কোন কোন দুষ্টু বালক তাহার গায়ে ছোট ছোট ইটের ঢেলা ফেলিয়া ভেঙচাইয়া আনন্দ অনুভব করিত। অরুণের সঙ্গী কুকুরটা ভেউ-উ-উ শব্দে তাড়া করিতে গেলে, অরুণ তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইত।

এটা আর কেহ লক্ষ্য করুক আর নাই করুক, মধু কিন্তু সেটা লক্ষ্য করিয়াছিল, আর করিয়াছিল বলিয়াই তাহার হৃদয়টা বালকের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া উঠিত। সে দুষ্টু ছেলেগুলিকে শুধু শাস্তি দিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, তাহাদের সে মাঠে আসা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। মধু কখন কখন তাহাদের সিঁড়িটার উপর অরুণের পাশে বসিয়া তাহাকে নানা প্রকার ছবির বই দেখাইত ও মাঝে মাঝে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিত, অরুণের নয়ন আনন্দে কতখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

৩

সে দিন আর তেমন করিয়া খেলা জমে নাই, অরুণ কুকুরটীর মুখে বিস্কুট গুঁজিতে গুঁজিতে কেবলই চাহিয়া দেখিতেছিল 'কেহ আসিয়াছে কিনা।'

দূরে একপাল ছেলে সঙ্গে লইয়া মধু আসিতেছিল, অরুণ তাহাকে দেখিয়া আনন্দে দাঁড়াইয়া উঠিল। মধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, যেন কতখানি ব্যগ্রতা অরুণের চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। সে বালকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিল, "যাবি বেড়াতে ?" অরুণ কথার উত্তরে শুধু চাহিয়া রহিল।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "তুমিও যেমন, তোমার কথা, কি ওর কাণে গেছে, ও কি শুনতে পায় ?"

মধু বেদনাভরা দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিয়া বলিল, "আহা ! বেচারা ! ইচ্ছে হ'চ্ছে, ওকে একটু ঘাটে মেলা দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

—সুদে-আসলে—

"চল না সঙ্গে ক'রে" বলিয়া একজন তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

"ছি! ছি! কচ্ছ কি," বলিয়া মধু সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া ইঙ্গিত করিতেই অরুণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

আজ কয়দিন হইতে কাশীর 'বুড়া-মঙ্গলের' মেলায় বালক, বৃদ্ধ, যুবা, হিন্দু, মুসলমান সকলেই আনন্দে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মেলাটী রাত্রেই মুখর ও শোভন হইয়া উঠে। সারি সারি তরণী সজ্জিত অবস্থায় গঙ্গার উপর হেলিতেছে দুলিতেছে। আলোয় আলোয় সমস্ত তরণী বিপণি সমুজ্জ্বল। তাহার রশ্মিজাল গঙ্গার নির্ম্মল জলধারার উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। প্রত্যেক সুসজ্জিত তরণীর উপর বাইজীর চটুল নৃত্যের সহিত সঙ্গীতের লহরী ভাসিয়া ভাসিয়া আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বালকেরা মধু ও অরুণের সহিত ঘাটে ঘাটে ঘুরিতে ঘুরিতে হল্লা করিয়া চলিয়াছে। অরুণের পা দু'খানি একপদও অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ছাপাইয়া একটী মাত্র ইন্দ্রিয় বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া নিজের কার্য্য করিয়া চলিতেছে। এত আলো, এত নৌকা, এত মানুষ, এত দোকান, এত সব—সে মায়ের সঙ্গে তো কত বার গঙ্গার ধারে আসিয়াছে, কই এমন ধারাটী তো কখনও চক্ষে পড়ে নাই! তাহার কেবল মাকেই মনে পড়িতে.

লাগিল। এই আনন্দ দৃশ্য তাহার একার পক্ষে বোধ হয় অত্যধিক বা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতেছিল; কারণ তাহার মুখে ও চোকে আনন্দের প্রতিবিম্বটা, ক্রমে ম্লান হইয়া যেন আতঙ্কের ছায়া ফেলিতেছিল। এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে, সে পরিবর্ত্তনটুকু একমাত্র মা-ই লক্ষ্য করিতে পারিতেন। সুতরাং আর কাহারও চক্ষে তাহা পড়িল না।

বালকেরা ততক্ষণ তাহাদের স্বভাবোচিত অভ্যাসের সহিত এক নৌকা হইতে অন্য নৌকায় লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছিল। অরুণ ভয়ে অনভ্যস্ত চরণে যেমন তাহাদের অনুসরণ চেষ্টায় লাফ দিবে অমনি চরণ স্খলিত হইয়া গঙ্গার মধ্যে পড়িয়া গেল। সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত হতভাগ্যের ছিল না এবং হাবা-কালা বলিয়া মা তাহাকে কখন জলে মাতিবার বা সন্তরণ শিখিবার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত দেন নাই, তাই বাধ্য হইয়াই অভাগা জলতরঙ্গের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিল।

বালকদের কাণে একটা 'ঝুপ্' শব্দ গিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহারা সেদিকে আদৌ লক্ষ্য করে নাই। কিছু পরে মধু লক্ষ্য করিল, অরুণ নাই। খোঁজ পড়িয়া গেল, কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টায় তাহারা শ্রান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল। সকলের মতে স্থির হইল, এ সম্বন্ধে কোন উচ্চ-বাচ্যের প্রয়োজন নাই। মধু প্রতিবাদ করিতেই একজন বলিয়া উঠিল, "তুমি কি আমাদের ফ্যাসাদে ফেলতে চাও।" মধু চুপ করিয়া

রহিল, বেচারার নয়ন-যুগল মূক বালকের জন্য বেদনার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

*　　*　　*　　*　　*

সন্ধ্যার একটু পরেই বেদবতী ব্যস্তভাবে স্বামীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাগা! খোকাকে তোমার ঘরে এতক্ষণ আটকে রেখেছ কেন?"

"কই কোথায় তোমার খোকা, এখানে তো নেই!" বলিয়া প্রভাতবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"অ্যাঁ কি বলছ তুমি, নেই কি গো, সন্ধ্যের একটু আগেও যে দোরগোড়ায় ভুলুর সঙ্গে খেলছিল!"

"বোধ হয় অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, যাবে আর কোথায়?"

বেদবতী তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়া ছাদময় খুঁজিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোথায় অরুণকুমার! ছাদ হইতে নামিয়া বাড়ীর প্রত্যেক স্থানটা তন্ন তন্ন করিয়া, একবারের জায়গায় সাতবার খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু সন্ধান মিলিল না। ক্লান্ত-চরণে হতাশ-হৃদয়ে স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া মিনতিভরা কাতর বচনে কেবল এইটুকু বলিলেন, "ওগো! আমার খোকাকে এনে দাও গো! তাকে যে কোথাও দেখতে পেলাম না।"

৪

পূর্ণিমা-রজনীর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে গঙ্গার বক্ষ বাহিয়া একখানি মাল বোঝাই বড় নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। নৌকায় দুইজন মাঝী দাঁড় টানিতেছে, আর একজন হাল ধরিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিয়া চলিয়াছে। মহাজনের লোক উপরে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে দাঁড়ের সপ্ সপ্ শব্দে রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। তাহারা এই মাত্র রাজঘাট অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় মাঝীদের মধ্যে যে ব্যক্তি হাল ধরিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছিল, হঠাৎ সে একটা কি ভাসমান পদার্থের প্রতি অন্য সঙ্গীদের আকৃষ্ট করিল। তাহারা সকলেই লক্ষ্য করিল, সত্যই যেন মানুষের মতন একটা কি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দাঁড়ী দুইজন তাহাকে জীবিত সিদ্ধান্ত করিয়া নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। দেহটী একটী বালকের। তাহাদের অভিজ্ঞতা মত শুশ্রূষার পর বালকের যেন একটু চৈতন্য সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিল। মাঝীরা

ও মহাজনের লোকটী, বালককে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিয়া কিছু জানিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল; কারণ সে সময় ওদিকে গঙ্গায় কোন কূলেই তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইল না; পুলিসের সাহায্য লইতেও সাহস হইল না। হাঙ্গাম পোয়াইতে না হইলেও,—তাহাতে দু'তিন দিন আটক পড়াই সম্ভব। এদিকে মহাজনের মাল সময়ে পৌছান চাই-ই। বালকটীকেও অসহায় অবস্থায়, তীরে ফেলিয়া যাইবার পক্ষে হৃদয় সাড়া দিল না। কাজেই নানা প্রকার আন্দোলন করিয়া সকলে স্থির করিল, গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া বাবুদের পরামর্শ মতে তাহারা বালকের যাহা হয় ব্যবস্থা করিবে। তাহারা কোন সওদাগরের সওদা লইয়া নৌকা-পথে ভাগলপুর যাইতেছিল।

৫

অরুণের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর হইতে বেদবতীর শরীর আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ব্যথা-নীরব মূর্ত্তির মত, কেবল মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রভাতবাবু তাঁহাকে লইয়া মধুপুর যাইবার প্রস্তাব করাতে তিনি বলিলেন, "না গো, আমায় কাশী ছেড়ে কোথাও যেতে ব'লো না।"

"তবে চিরকালটা এই কাশীতে প'ড়ে থাকতে হবে নাকি? আজ কতদিন তো খোঁজ করলেম সে কি আর—" হঠাৎ স্ত্রীর চক্ষুর উপর দৃষ্টি পড়িতেই অপ্রতিভের ন্যায় শেষ কথাগুলি চাপিয়া গেলেন। তিনি তাঁহার বুকের মাঝে পুরুষের কাঠিন্য একটু বেশী মাত্রায় রাখিলেও পুত্রহারা মায়ের মুখের উপর এ অবস্থায় পুত্রের জীবন-মরণের কথা তাঁহার বলিতে সাহস হইল না। আজ অবস্থার শাসন তাঁর কাঠিন্যের উপর বেশ একটু আধিপত্য করিয়া গেল।

"সে নিশ্চয়ই কোথাও আছে" দৃঢ়তার সহিত এই কথা কয়টা বলিয়া নিরুত্তর হইলেন।

—সুদে-আসলে—

সেদিন প্রভাতবাবু বিকালে বেড়াইয়া ফিরিবার পর বেচারাম আসিয়া জানাইয়া গেল, খোকাবাবুর ভুলু কুকুরটা শিকলী ছিঁড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অনেক খোঁজ করা হইয়াছে কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় নাই। বেদবতীও লক্ষ্য করিতেছিলেন; অরুণ চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই কুকুরটা যেন কেমন হইয়া যাইতেছে; আর সে খাদ্যদ্রব্য দেখিলে তেমন লম্ফ ঝম্ফ দিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ করে না, আর সে লেজ নাড়িয়া তেমনি যাহার তাহার পায়ের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়ে না, প্রায়ই দেখা যায় সে যেন এঘর ওঘরে কাহারও অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, শেষে হতাশ হইয়া সদর দরজায় গিয়া মুখ তুলিয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বেদবতীর প্রাণও হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠে, তিনি ঘরের মেজেয় পড়িয়া নীরবে ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন।

কয়দিন হইতে বাড়ী ফিরিবার কথা লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটু থাপছাড়া ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে বেদবতী যখন স্বামীকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, তখন অগত্যা প্রভাত-বাবু স্ত্রীর কাশীবাসের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আশার মোহে বেদবতী কাশীতেই পড়িয়া রহিলেন। সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেবতার দুয়ারে মাথা কুটিয়া হৃদয়ের প্রার্থনা কাতর ভাষায় প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের চরণতলে পৌছাইয়া দিবার একান্ত বাসনায় বেদবতী নিজের আহার নিদ্রা
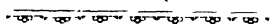
পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে বসিয়াছিলেন। "ওগো দাও, আমার স্নেহের বাছাকে আমার কোলে ফিরে দাও।" মাতৃহৃদয়ের এই প্রার্থনা দেবতার দুয়ারে পৌঁছিয়াছিল কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক, তাঁহার অন্তরের অন্তর হইতে অলক্ষিত দেবতাটী তাঁহাকে সত্যই যেন আশ্বাস দিয়াছিল, আর দিয়াছিল বলিয়াই বেদবতী আজও বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু এই বাঁচা যে কতখানি কষ্টের সেটা সেই দেবতাকেও তিনি বুঝাইতে পারেন নাই। এমন করিয়া বেদবতীর দিন যাইতে লাগিল।

৬

এখন অরুণকুমারের কথা। মাঝীরা ভাগলপুর নামিয়াই আগে অরুণের ব্যবস্থার চেষ্টা পাইয়াছিল। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কথা কহে না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে, খাইতে দিলে মারিতে আসে আর গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদে ; আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সকলে সেখানকার অনাথ আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষকে ধরিয়া পাগলের ভার দিয়া তাহারা মুক্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

অরুণ সেখানে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। আশ্রমের নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে অরুণ যেন বন্দিত্বদশা প্রাপ্ত হইল। সে যে নৌকায় মাঝীদের কাছে এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সমস্ত হৃদয়খানি ভরিয়া কান্না ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। যে দিন সে কান্নায় গুমরিয়া গুমরিয়া শেষে অবসাদে দেহখানি এলাইয়া মাটিতে অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িত, সে দিন আর তাহার ভাগ্যে আহার জুটিত না। মুক্ত বিহঙ্গম পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার
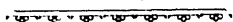
আগ্রহে যেরূপ ছট্‌ফট্‌ করে, মুক্তির পথ খুঁজিয়া বেড়ায়, অরুণকুমারও তেমনি ছট্‌ফট্‌ করিয়া সেই আশ্রমের গণ্ডীর বাহিরে পা দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিত এবং একদিন দিয়াও ফেলিল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া গাছের ফল পথের খাদ্য কুড়াইয়া খাইয়া তাহার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। তাহাতে সে যেন তৃপ্তি অনুভব করিত। নীল আকাশের তলায় রজনীর আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া সে কোন বাগানের গাছের নীচে মুক্ত বায়ুর হিল্লোলে ঘুমাইয়া পড়িত, আবার তেমনি সূর্য্যের প্রথম কিরণে স্নাত হইয়া জাগিয়া উঠিত। রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত তাহার সুখলালিত দেহখানির উপর বহিয়া বহিয়া তাহাকে প্রকৃতি অন্য রকমে গড়িয়া তুলিতে লাগিল। অরুণ অন্য রকমের মানুষ হইয়া দাঁড়াইল। এক বোঝা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মলিন শতছিন্ন বস্ত্রখানি যেন কোন উপায়ে দেহ সংলগ্ন আছে।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে সে অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্যহীন ঘুরিতে ঘুরিতে একখানি বাংলার সম্মুখে আসিয়া কি ভাবিয়া ফটকের রেলিংয়ে হাত দু'খানি ধরিয়া বাংলার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মিষ্টার সেন ও তাঁহার পত্নী বারান্দায় বসিয়া সন্ধ্যার সুখ-সমীরণের স্নিগ্ধতায় একটুখানি শান্তি পাইয়া কত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। মিষ্টার সেনের পায়ের কাছে পপি শুইয়া আছে।

—সুদে-আসলে—
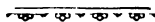
হঠাৎ মিসেস্ সেন বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্ছ দেখ্ছ একটী ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে রয়েছে।"

মিষ্টার সেন সেই দিকে চাহিয়া একটু কৌতুকপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "দেখবে মজা! পপি! পপি!" তিনি বাহিরের দিকে পপিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিলেন। পপি গা ঝাড়া দিয়া চীৎকার করিতে করিতে বালকের দিকে ছুটিল। কিন্তু রেলিংয়ের কাছে আসিয়া বালকের দিকে চাহিতেই তাহার একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তাহার ক্রোধ গেল, চীৎকার গেল, বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে ফুটিয়া উঠিল যেন একটু ভাবনা ও বিস্ময়! সে কেবলই বালকের গা শুঁকিতে লাগিল, আর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

মিষ্টার সেনের নির্দ্দেশিত বালকটী কিন্তু কিছুই বুঝিল না। এরূপ প্রচণ্ড ক্রোধের সহিত কুকুরটী ছুটিয়া আসিয়া সহসা কেন যে এরূপ মন্ত্রমুগ্ধের মতন চাহিয়া রহিল, সে শুধু তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কুকুরটীর চোখের মধ্যে সহসা সে যে ভাবটুকু দেখিতে পাইল, তাহার সেই নিতান্ত পরিচিতের মত, সেই শান্তভাবে লেজ নাড়া দেখিয়া, আজ তাহার মধ্যে অনেক কালের অতি ক্ষীণ একটা পুরাতন স্মৃতি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না, ভাষাহীন দু'টী প্রাণের মাঝেই আজ পরস্পরের যেন একটা টান দেখা দিল। ভুলুকে অরুণের মনে পড়িল, আর মনে পড়িল বলিয়া একে একে অনেক পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল,

মার মুখখানি, স্নেহের টানটুকু, এমনি আরও কত কি তাহার মনে পড়িল। তাহার হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া গেল, চক্ষুদু'টী জলে ভরিয়া আসিল।

এদিকে মিষ্টার সেন দেখিলেন যে, পুপি পরিচিতের ন্যায় ভিখারী বালকের সহিত নানা ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিতেছে। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া পপিকে ডাকিলেন, কিন্তু সে নিতান্ত অবাধ্যের মতই আজ তাঁহার আদেশ অমান্য করিল। কাজেই তিনি কুকুরটীকে সেখান হইতে টানিয়া না আনিয়া বালকটীকে তাড়া দিয়া বিদায় করিলেন। বেচারী অরুণ কুকুরটীর দিকে চাহিতে চাহিতে সজলচক্ষে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনেই সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল; কিন্তু পরদিন কি যেন একটা আকর্ষণ তাহাকে আবার সেইখানে টানিয়া আনিল, তখন সে যে ভুলুকে নিঃসন্দেহই চিনিয়াছে, সে যে নিখিল বিশ্বে আপনার জনের মধ্যে একটীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। সেই তাড়না আবার সহিতে হইল, কিন্তু এমন অপমান সত্ত্বেও সে যখন তৃতীয় দিন আবার নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মিসেস্ সেনের অন্তরে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল, "এত তিরস্কার, এত অপমান সহিয়াও সে যে মুখখানি নীচু করিয়া চলিয়া যায়, কোন কথা কহে না, আবার ঘুরিয়া আসে, কেন?" মিসেস্ সেনের অন্তরে নারীর প্রকৃতি সাড়া দিয়া উঠিল। সেইজন্য আজ তিনি স্বামীকে বলিলেন, "ওগো, দেখ না, ছেলেটী রোজ আসচে, একবার ডাক না।"

মিষ্টার সেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কোথাকার ভিখিরী, ডেকে কি হবে।"

'কিন্তু'—প্রতিবাদ করিয়া মিসেস্ সেন বলিলেন, "কিন্তু আমার মন বলছে ও ঠিক ভিখিরী নয়, আর এটাও আমার মনে হয়, পপি বালকটাকে যেন চেনে।"

"হ্যাঁ তোমার যেমন কথা! মনে নেই কি যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে বেনারস ক্যাণ্টের হাঁসপাতালের চার্জ্জ নিয়েছি, পপি তার দিন কতক পরেই এসে জুটেছে, সে তো আজ তিন চার বছরের আগের কথা। পপিকে তো আর ভাগলপুরে পাইনি, আর সে আমাদের কাছছাড়াও হয় না যে, ওর সঙ্গে পরিচয় হবে।" কথাগুলি না শেষ হইতেই মিসেস্ সেন অন্যমনস্কভাবে অরুণকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া ফেলিলেন। অরুণ ধীরে ধীরে ফটক অতিক্রম করিয়া ভিতরে আসিতেই পপি তাহাকে কাছে পাইয়া একেবারে পায়ের উপর শুইয়া পড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার আনন্দের উচ্ছ্বাসটা একটু বেশী করিয়াই মিসেস্ সেনকে আকৃষ্ট করাইল, তিনি বালককে কাছে ডাকিলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসার পর উভয়ে বুঝিলেন 'বালক হাবা ও কালা।'

৭

তারপর তিনটী দিন চলিয়া গিয়াছে, এই তিন দিনেই মিষ্টার শান্তিময় সংসারে অনেক অশান্তি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

মিসেস্ সেনের ধারণা—ছেলেটী ভদ্রবংশের, আর পপির সঙ্গে তার পূর্ব্ব পরিচয় আছে। মিষ্টার সেন বলেন—"ওটা তোমার একটা খেয়াল মাত্র, আর পপির ব্যবহার একটা আকস্মিক ঘটনা বই আর কিছুই নয়।"

মিসেস্ সেনের আপত্তি—"তবে ঘটনাটা নিত্য ঘটে কেন?"

মিষ্টার সেন বলেন—"পপি নিশ্চয়ই ভুল করেছে।"

মিসেস্ সেন তাহাতেও পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলেন—"বালকটীও কি নিত্য ভুল ক'রে আসে? সে তো কিছু চায় না।"

তাহাতে মিষ্টার সেন বিরক্ত হইয়া বলেন—"বালকদের ওটা স্বভাব, তা ছাড়া ও বিষয় নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথায় দরকার কি।"

এই শেষ কথা কয়টীই মিসেস্ সেনের অভিমানের কারণ। একটী অজানা অসহায় বালক সম্বন্ধে পুরুষদের মাথাব্যথা না হইতেও পারে, কিন্তু মায়ের জাতের, সেটা না হওয়াই অস্বাভাবিক। নারী-সুলভ স্নেহবশেই হউক বা কৌতূহলবশেই হউক, মিসেস্ সেনের মাতৃহৃদয় বালকটী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিষয় লইয়া ইতিমধ্যে মান-অভিমানের এত অভিনয় হইয়া গিয়াছে যে, গত রাত্রে বাধ্য হইয়াই মিষ্টার সেন পত্নীর প্রস্তাবে মত দিয়াছেন যে, তিনি বালকটী সম্বন্ধে যথাসম্ভব খোঁজ লইবেন। পর-দিন প্রসঙ্গক্রমে কথাটা তিনি সর্ব্বাগ্রে হাঁসপাতালের সহকারীদের কাছেই উত্থাপন করেন। সবিশেষ শুনিয়া ড্রেসার বলিল—"অনেক দিন হ'ল ঐ রকম একটী বোবা-কালা ছেলের ড্রেস করতে আমি অনাথাশ্রমে যেতাম; সেখানে একবার খোঁজ নিলে ভাল হয়; তারা বালকের পূর্ব্ব ইতিহাসও কিছু কিছু রাখে।" সেদিন নিয়মিত সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া মিষ্টার সেন ক্লাবে না গিয়া অনাথাশ্রম হইয়াই বাংলায় ফিরিলেন।

মিসেস্ সেন হাসিয়া বলিলেন—"আজ যে আমার বড় ভাগ্য দেখছি!"

সে কথার উত্তর না দিয়া মিষ্টার সেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছেলেটী এসেছিল কি?"

প্রশ্নটা সহজভাবে হইলেও, তাহার মধ্যে একটা আগ্রহের সুর

মিসেস্ সেনের কাণে বাজিয়া উঠিল। তিনিও তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া, ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "কিছু সন্ধান পেলে নাকি!"

মিষ্টার সেন টুপিটা র‍্যাকে রাখিয়া, চেয়ার টানিয়া লইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমারই জিত্।"

মিসেস্ সেনের আগ্রহ তাঁহাকে ইজি-চেয়ার হইতে সবেগে তুলিয়া একেবারে মিষ্টার সেনের পার্শ্বে উপস্থিত করিয়া দিল। মিষ্টার সেন অনাথাশ্রম হইতে বালকটী সম্বন্ধে যতটুকু ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে বলিয়া গেলেন, মিসেস্ সেন নিষ্পন্দ বিস্ফারিত নেত্রে প্রস্তর মূর্ত্তির মত তাহা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন; কেবল—মাতৃ-প্রকৃতির করুণ উচ্ছ্বাস ও অশ্রু, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে স্পন্দিত করিতেছিল।

৮

কয়েক মাস হইতে মিষ্টার সেনের এক বন্ধু বেনারস গিয়া তাঁহার ছুরি-কাঁচির নব প্রতিষ্ঠিত কারখানাটা একবার দেখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন। বন্ধুর ইচ্ছা, মিষ্টার সেনের পরিদর্শনের পর, ডাক্তারি অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। মিষ্টার সেন, ইষ্টারের বন্ধে যাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। ছুটী আরম্ভ হইতে আর পাঁচটা দিন মাত্র বাকি। এই অবকাশে, বালকটাকে ও পপিকে লইয়া, সস্ত্রীক বেনারস যাইয়া, মিসেস্ সেনের ধোঁকাটা মিটাইয়া আসিবেন স্থির করিয়াছেন; কারণ, ব্যাপারটা ক্রমেই তাঁহার অশান্তিকর হইয়া উঠিতেছিল।

বালকটা বোবা কালা হইলেও, কুকুরটার স্মৃতি ও ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে যে তাহার বাড়ী খুঁজিতে কষ্ট পাইতে হইবে না, মিসেস্ সেনের এই বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ছিল; আর কুকুরটা কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই, বালকের বাড়ী যে কাশীতে, এ বিষয়েও তিনি স্থির নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু কাশীতে আসিয়া পাচ পাচটা দিন

নিষ্ফলে কাটিবার পর, তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সকল আশা সকল কল্পনা ভাসিয়া গেল।

অদ্য বৈকালের ট্রেণে ভাগলপুর ফিরিতে হইবে। প্রাতে চায়ের মজলিস্ জমিল না, মিষ্টার সেন ও মিসেস্ সেন অন্যমনস্ক-ভাবেই নীরবে কাজটা সারিলেন। বন্ধু তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রস্তাব করিলেন, "বুড়া-মঙ্গলের মেলা আরম্ভ হয়েছে, চলুন আজ গঙ্গাতীরে বেড়িয়ে আসা যাক্।" মিসেস্ সেন বলিলেন—"সেই ভাল।"

মেলার আজ দ্বিতীয় দিন। দশাশ্বমেধের গঙ্গাবক্ষে সুসজ্জিত তরণী সকল ভাসিতেছে। এখন মেলার ভিড় নাই, স্নানার্থী নরনারীর বাহুল্যই, ঘাটটীকে সন্ধ্যা-বন্দনা-মুখর করিয়া রাখিয়াছে। প্রভাত সমীরণ, তাহারই পবিত্র ভাবটী বহন করিয়া, সকলকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে। তাপিত—ক্ষণতরে সকল জ্বালা ভুলিতেছে, ভাবুক—তাহা উপভোগ করিতেছে, ধর্ম্মপ্রাণ—নির্ব্বাক্ আনন্দে আপনাকে তাহার মধ্যে মিশাইয়া দিতেছে। এমন সময় মিসেস্ সেনের চাঁপা রংয়ের পার্শী সাড়িটী যেন সদ্যঃ বিকশিত পুষ্পের অর্ঘ্যের মত 'বেহারী বাবার' মন্দির সম্মুখে, সহসা দেখা দিল!

অরুণকুমার ক্যাণ্টনমেণ্টে কখনও যায় নাই, সুতরাং কয়দিন ক্যাণ্টনমেণ্টে ঘুরিয়া, কোন পরিচিত বস্তুই তাহার চক্ষে পড়ে নাই। কাশীতে থাকিবার কালে সে তাহার বাড়ীর আশে পাশের অলিগলি চিনিত, আর চিনিত দশাশ্বমেধ ঘাট, যেখানে সে মাতার আঁচল

ধরিয়া প্রায়ই নাহিতে আসিত। তাই আজ সে নূতন বেশে, নূতন মায়ের হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে যখন সেই পরিচিত ঘাট-টাতে আসিল, তখন সে কেমন যেন ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এইখানে, ঠিক এইখানে, তাহার মা কতদিন ওই মর্ম্মর-মূর্ত্তিকে পুষ্প চন্দনে পূজা করিয়া তাহার মাথাটা নোয়াইয়া মূর্ত্তির কাছে কতবার ঠুকিয়া দিতেন। সেই স্মৃতি যেন তাহার মনোমধ্যে জাগিতে লাগিল। তাহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল। কি একটা আশায় সে কেবল সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

উজ্জ্বল বসন-বিভায়, মিসেস্ সেন যেন সকলেরই লক্ষ্যের সামগ্রী হইয়া পড়িলেন। কি স্তবমগ্না, কি লজ্জাবনতা, কি বিয়োগবিধুরা —নারীস্বভাব কাহাকেও সেই অপরিচিতা সুবসনার দিকে বিস্ময় ও কৌতূহল দৃষ্টিপাত না করিয়া যাইতে দিল না। তাঁহার পার্শ্বেই ভব্য বেশে অরুণ ও চঞ্চল পপি। মিষ্টার সেন ও তাঁহার বন্ধু একটু তফাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া ভাগীরথীর শোভা দেখিতেছেন। সূক্ষ্মদর্শীর নিকট, মিষ্টার সেনের দৃষ্টি কিন্তু লক্ষ্যশূন্য, তিনি যেন গভীর চিন্তামগ্ন। তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, স্ত্রীবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া, যে আশায় কাশী আসিলেন, তাহা তো নিরর্থক হইল; পূর্ব্বেই এই দুর্ব্বলতাটুকু ত্যাগ করিলে, এত ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইত না। কোথা হইতে এই অনাহূত অশান্তি আসিয়া জুটিল ; এখন এই বোবা কালাকে লইয়া কি করা যায়—এই সব।

ঠিক ঐ সময় একটী রমণী স্নানান্তে 'বেহারী বাবার' মন্দিরে প্রণাম করিতে আসিয়া, অরুণকে মন্দির মুখে পাইয়া, অতি কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা একটু স'রে দাঁড়াও না।"

সস্নেহ অথচ কাতর রমণী-কণ্ঠ শুনিবামাত্র, মিসেস্ সেন যেন অপ্রতিভের মত তাড়াতাড়ি অরুণের হাত ধরিয়া টানিলেন। অরুণ অবাধ্যের ন্যায় একপাও নড়িল না। মিসেস্ সেন দেখিলেন, সে রমণীর দিকে পাগলের মত বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে; তাহার হস্ত, মিসেস্ সেনের মুষ্টির মধ্যে কাঁপিতেছে! রমণীও মর্ম্মরপ্রতিমার মত নিস্পন্দ হইয়া, বিস্ময়-স্তম্ভিত দৃষ্টিতে অরুণের প্রতি চাহিয়া আছেন, পপি তাঁহার পদপ্রান্তে দুই পায় ভর দিয়া ঊর্দ্ধমুখে অস্ফুট শব্দ করিতেছে। সহসা রমণীর নিমেষশূন্য স্থির দৃষ্টি, মিসেস্ সেনের দিকে ফিরিয়াই ব্যথিত হৃদয়ের বিগলিত ধারায় বোধ হয় অন্ধকার দেখিল। তাঁহার বাম হস্ত, মন্দির-গাত্রে অবলম্বন খুঁজিল। সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ, ক্ষিপ্তের মত সজোরে মিসেস্ সেনের হাত ছাড়াইয়া রমণীর বক্ষে গিয়া পড়িল;—তাহার বুকের সমগ্র ব্যাকুলতার প্রবল তাড়নায়, তাহার কণ্ঠ হইতে সেই বহু বাঞ্ছিত শব্দ,—মায়ের দুর্লভ ঐশ্বর্য্য,—অস্পষ্টতার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া বেদবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল,—"**মা**"!

কীর্ত্তনীয়া

১

কামারহাটীর মহামান্য গোস্বামী বংশের একমাত্র বংশধর হরিপদ গোস্বামী যেদিন নিজের অত বড় একটা পদ-মর্য্যাদা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া সাধারণের মতনই চাকুরীবৃত্তি অবলম্বন করিল, তাহাতে লোকে যে হরিপদকে 'ছি-ছি' করিয়াই ক্ষান্ত হইল শুধু তাহাই নহে, অনেকে তাহাকে গোস্বামী বংশের একটা পাপ বলিয়া ঘৃণায় মুখ পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া থাকিল। কিন্তু যে লোকটীকে লইয়া এতখানি, সে নিজে অথচ অতখানি ঘৃণার পরেও টিঁকিয়া থাকিয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিল।

কামারহাটী হইতে মাঝে একটা মাঠ হাঁটিয়া ও একটা ষ্টেশন রেলে চড়িয়া হরিপদ খড়দা জুট্‌-মিলে কাজ করিতে আসিত,
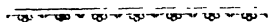
মাহিনা পাইত মাসে পঞ্চাশটী করিয়া টাকা। সংসারে তাহার মায়া করিবার মত কেহ ছিল না; সুতরাং অর্থের বড় বেশী একটা প্রয়োজনও ছিল না। হরিপদ সেদিন আফিসে যাইবার পথে শুনিয়া গেল, বাঙ্গালার দোয়েল-কণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্যামাদাসের দল জমিদার-বাড়ী আসিয়াছে, জমিদার মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীর দোলযাত্রা-উপলক্ষে। সেই জন্য গ্রামে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া না গিয়াছিল, এমন নহে।

আজ ইংরাজি মাসের পয়লা। হরিপদ আফিসের কাজকর্ম্ম সারিয়া মাহিনার টাকা কয়টা বুঝিয়া লইয়া অন্যদিনের অপেক্ষায় সেদিন বেশ একটু রাত্রি করিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল ছ'টার গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কাজেই বাধ্য হইয়া হরিপদকে পরের ট্রেণে আসিতে হইল। ষ্টেশনে নামিয়া দেখিল, ষ্টেশন প্রায় জনশূন্য। তাহার পথের সঙ্গী হইবার মত কেহই নাই; সুতরাং তাহাকে একলাই মাঠের পথ ধরিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে হইল।

কিন্তু এই মাঠটীর সম্বন্ধে একটা শৈশব-শ্রুত প্রবাদ সহসা স্মরণ-পথে আসায় মাঠটীর পথে পা দিতেই তাহার বুকখানা ভয়ে 'ধপ্' করিয়া উঠিল, তবুও হৃদয়ে অসীম সাহস পূরিয়া হরিপদ চলিতে লাগিল।

২

এ বেশীদিনের কথা নয়, তখন নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে একদল লোক ছিল ; যাহারা দিনে কাজ-কর্ম্ম করিত আর রাত্রে মাঠে, পথে, নির্জ্জনে সুযোগ পাইলেই লোকের মাথায় লাঠী বসাইয়া লুট্‌ করিয়া বেড়াইত। এই শ্রেণীরই দুটী লোক সন্ধান রাখিয়াছিল, আজ হরিপদ অনেকগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। টাকাগুলি যে তাহার মাহিনার এ সংবাদও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না।

মাঠটা যে মস্ত বড় তাহাও নহে, আবার খুব ছোটও বলা যায় না। এখানে সেখানে ছোট বড় দু'একটা গাছ সেকালের লম্বা পাঁচ হাত মানুষের মত হাত পা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের জটার মত চুলগুলি অল্প অল্প বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া একপ্রকার সাঁ সাঁ শব্দ হইতেছিল। চন্দ্র-কিরণ সমস্ত মাঠটার উপর সাদা ধপ্‌ধপে কাপড়খানার মতন বিছাইয়া পড়িয়াছিল ; বনফুলের মিশ্রিত মৃদু গন্ধটুকু বায়ুকে ভরাইয়া তুলিয়াছে। হরিপদ সেই নির্জ্জন

মাঠের সামান্য অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় মৃদঙ্গ ও করতালের একটা অস্পষ্ট শব্দ বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, আজ জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে শ্যামাদাসের দল কীর্ত্তন গাহিতে আসিয়াছে। হরিপদ শুনিল, বায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিতেছে ;—

"ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাইল রে।
মলয়ানিল, হিম শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজদেশে না আইল রে।"

আজ পুরাণোকালের পর্দ্দাটার ফাঁক দিয়া হরিপদ হৃদয়ের অনেকখানি সন্ধান পাইয়া গেল। মনে হইল সেই অতীত শৈশবের কথা। ছেলেবেলা সে কত বড় বড় দলের কীর্ত্তন শুনিয়াছে। কি সে আনন্দ সেই কীর্ত্তন শোনায়! আজ কতদিন হইল এই কীর্ত্তন শোনা বন্ধ হইয়াছে, কতকটা চাকরীর কল্যাণে আর কতকটা শুনিবার সুযোগ পায় না বলিয়া। তাহাদের বাড়ীতে যখন রাসযাত্রা, দোলযাত্রা-উপলক্ষে বড় বড় কীর্ত্তনীয়ার দল আসিত, সে তখন বালক মাত্র। বড় হইয়া অবধি হরিপদ এক নীলকণ্ঠের দল ছাড়া আর কাহারও কীর্ত্তন শোনে নাই। তবে গ্রামের আনাচে কানাচে সন্ধ্যার সময় যে সব কীর্ত্তনের বৈঠক বসিয়া যাইত, তাহা যে শোনে নাই এমন নয়।

-কীর্ত্তনীয়া—

চিন্তায় চিন্তায় কখন যে তাহার গতি মন্দ হইতে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল এটা তাহার নিজেরই অগোচর ছিল। চন্দ্রের আলোকে দূর হইতে কুয়াসা-মোড়া গ্রামের গাছ-পালাগুলি ও জমিদার মহাশয়ের অট্টালিকার উঁচু মাথাটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। গ্রামের প্রবেশ-পথেই জমিদার মহাশয়ের মস্ত বাড়ী-খানা প্রহরীর মতই দাঁড়াইয়া গ্রামকে যেন পাহারা দিতেছে।

কীর্ত্তনের মধুর আবেশে হরিপদ বিভ্রান্ত হইয়া গেল, গোস্বামী বংশের ছেলে সে, সেই ভাবটুকু স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল।

থমকি থমকি চলিয়া চলিয়া সে তখনও মাঠটার অর্দ্ধেকও ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঠের অজানা ভয়টা তো দূরের কথা, শীতের শিহরণটুকু পর্য্যন্ত সে অনুভব করিতে পারে নাই, ভাবে এমনি সে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। খোল করতালের মধুর ধ্বনির তালে তালে কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠ মিশিয়া মিশিয়া গীত হইতেছিল ;—

"বঁধুরে কহিও মোর কথা—
অনলে পশিব যদি না আইসে হেথা।"

দক্ষিণাবায়ু হরিপদর কাণের কাছে এক পসলা সুধাবৃষ্টি করিয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া দিয়া গেল। আর চলা হইল না। সে সেই মাঠের মধ্যেই দাঁড়াইয়া পড়িল। কাণ পাতিয়া রহিল সেই ভেসে
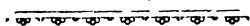
আসা সঙ্গীতের প্রতি। হরিপদ মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল, কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছিল ;—

"আর না যাইব সোই যমুনার জলে
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে"

হরিপদও উচ্ছ্বসিত হইয়া পদদুটী কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠের সহিত মিশাইয়া আপন মনে গাহিয়া গেল ;—

"আর না যাইব সোই যমুনার জলে
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে"

পূর্ব্বের যে দুইজন ঠ্যাঙ্গাড়ে লোক হরিপদর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন আর একজনকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "সর্দ্দার, আর দেরী নয়, ব্যাটাকে ভাবে লেগেছে, দিই লাঠি বসিয়ে মাথায় !" কথাটা শেষ করিতে করিতেই দস্যু লাঠী গাছটা বাগাইয়া ধরিল। এদিকে কীর্ত্তনের যে ভক্তিমাখা হিল্লোলটুকু হরিপদর মর্ম্মস্থলে সুখ-বেদনার আঘাত করিতেছিল, আর সেই আঘাতে তাহার মর্ম্মের কতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছিল, তখনকার মত সেটা আর কেহ না বুঝিলেও সর্দ্দার নামে অভিহিত ব্যক্তিটী কতকটা বুঝিয়াছিল এবং অনুভবও কিছু করিয়াছিল। হরিপদ তন্ময় হইয়াছিল কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠের মধুমাখা

বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী শ্রবণে; আর এই নীচ-প্রকৃতি লোকটা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল হরিপদর সেই ভক্তি-গদ্‌গদ ভাব দেখিয়া! তাহার মন হইতে এই কথাটা বার বার ঠেলিয়া উঠিতেছিল, 'আমরা' কত কীৰ্ত্তন শুনিয়াছি, আমাদের আড্ডায় কত কীৰ্ত্তন গাহিয়াছি, কই এমনভাবে তো কাহাকেও মাতিয়া উঠিতে দেখি নাই। না, এমন লোকটাকে মেরে ফেলা কখনই হ'তে পারে না, এ যে ভগবানের বড় ভক্ত; এই ভাবটা নররক্ত-কলুষিত ঘৃণিত ছোট জাতটার মনে কে যেন জাগাইয়া দিতেছিল, আর দিতেছিল বলিয়াই —সর্দ্দার তাহার অনুচরের উদ্যত লাঠীখানি একহাতে ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "নারে ভাই, এরে মারিস্ না, দেখ্‌ছিস্ না ভগবানের নামে ও কতখানি ভাবে মেতেছে!"

অনুচর আশ্চর্য্যভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সর্দ্দারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কহিল, "সর্দ্দার, আজ আর নেশার ঘোরে হাত উঠ্‌ছে না তোর? ভয় পেয়েছিস্?"

৩

কতখানি রাত্রি হইয়া গেল। ফাল্গুনের মধুর বাতাসটুকু বেশ একটু শীতল হইয়া আসিল, কিন্তু হরিপদর তাহাতে দৃষ্টি নাই। সুরে সুরে তাহার হৃদয় নাচিতেছিল, শরীর ভাবাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল! কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছিল ;—

"কানুকে ঐছে দশা শুনি বিরহিণী
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি ক্ষিতিতলে মুরুছলি
সখিগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥"

হরিপদ সত্যই যেন আজ রাইভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

তাহার চক্ষে এই আকাশ বৃন্দাবনের আকাশ, এই শষ্প-বৃক্ষলতা-শোভিত মাঠ বৃন্দাবনের সেই কুঞ্জবন! সে কল্পনার আবেশে আর দাঁড়াইতে পারিল না। বিহ্বলের মত সেই মাঠের মাঝখানে বসিয়া পড়িল; দেখিতে পায় নাই, ঠিক সেইখানে একটা প্রকাণ্ড

গোখুরা সাপ ফণা গুটাইয়া শুইয়া ছিল! বসিয়া পড়িবার সময় হরিপদর একখানা পা ছট্‌কাইয়া তাহার শরীরে আঘাত দিল। গোখুরা গর্জ্জন করিয়া হরিপদর পায়ের উপর এক তীব্র ছোবল বসাইয়া দিল। ঢুলিতে ঢুলিতে সে সেইখানে ঢলিয়া পড়িল।

যখন অনুচর সর্দ্দারের উপর বিস্মিত দৃষ্টি ফেলিয়া সে নেশায় ভোঁ হইয়া আছে বলিয়া অনুযোগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময় দৃষ্টি পড়িয়া গেল যে, সাপটা হরিপদকে দংশন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে আনন্দে সর্দ্দারকে একটা ধাক্কা দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নাও কর্ত্তা, তুমি ব্যাটাকে ভাবে লেগেছে দেখে দেরী কচ্ছিলে; যাক্! ব্যাটাকে সাপে খেয়েছে, একেবারে সাবাড়, চল টাকাকড়িগুলো নিয়ে সট্‌কে পড়ি।" অনুচর অগ্রসর হইয়া পড়িল।

তখনকার নীচজাতি লোকগুলার মধ্যে অনেক গুণ থাকিত এবং যাহারা ঐ সকল গুণের অধিকারী হইত, তাহাকে অন্য অন্যরা সর্দ্দার বলিয়া মানিয়া চলিত। এই সকল সর্দ্দারেরা নানা প্রকার তুক্ তাক্ ঝাড় ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্র জানিত।

সর্দ্দার অনুচরকে বাধা না দিয়া তাহার সঙ্গে হরিপদর নিকটে আসিল। অনুচর হরিপদর দেহ-স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সর্দ্দার তাহাকে আদেশ দিল, "নে কাঁধে ওঠা!" অনুচর ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বলিল, "মরা ঘাড়ে ক'রে কি হবে কর্ত্তা!" সর্দ্দার জবাব

দিল, "এর বাড়ীতে নিয়ে যেতে, আমি একে বাঁচাব, অনেককে তো মেরেছি, এ লোকটাকে মরতে দেবো না, দেরী করিস্‌নি, চল।"

তখন তাহারা দুইজনে হরিপদর দংশিত দেহখানি ধরাধরি করিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত করিল। প্রায় সমস্ত রাত্রি ঝাড় ফুঁক্ করিয়া সর্দ্দার হরিপদর দেহে জীবন-সঞ্চার করিয়া তুলিল। ভোরের শীতল বাতাসের কোমল স্পর্শ হরিপদর দেহখানির উপর স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া দিয়া গেল। সে ক্লান্তভাবে ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া একবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

জমিদার বাড়ীতে ঊষা-কীর্ত্তন হইতেছিল। কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছিল ;—

"পদ উধ কাক, কোকিলের ডাক,
জানাইল রজনীর শেষ।
তুরিতে নাগরী গেলা নিজ ঘরে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥"

কীর্ত্তনের সুমিষ্ট করুণ সুর কাণে যাইতে হরিপদ ভাবাবেশে আর একবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অন্নকূট

১

কার্ত্তিক মাসের অপরাহ্ন বেলায় গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া অল্প শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সরলা যেমন শুষ্ক কাপড়খানি লইয়া পরিতে যাইবে, এমন সময় পাশের ঘর হইতে তাহার ভ্রাতৃজায়া পঙ্কজিনী বাহির হইতে হইতে হাঁকিয়া উঠিল, "কি গো, কাপড় কাচা হ'লো, এদিকে বেলা যে পড়ন্ত সে হিসেব আছে ?"

"এই যে ভাই, যাই।" তাড়াতাড়ি মলিন শতগ্রন্থিযুক্ত কাপড়খানির দ্বারা কোন উপায়ে লজ্জা রক্ষা করিয়া সরলা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

ঝি তারামণি রান্নাঘরের একপাশে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল ; উনানও বেশ ধরিয়া উঠিয়াছিল। কড়াখানা উনানের উপর

চাপাইয়া খানিকটা তেল ঢালিতে ঢালিতে সরলা বলিল, "চট্ ক'রে গোটা কতক পটল চিরে দাও না তারা দি'।"

"দি, দিদিমণি, আহা, আজ একে অবেলায় খাওয়া হয়েছে তাও পেটটা ভরেছে কি না, কে জানে, আবার এসেই একপাল লোকের হেঁসেল ঠেলা, কত আর সইবে বল।" তারামণি সমবেদনাপূর্ণ একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া পটল চিরিতে ব্যস্ত হইল।

সরলা হাতখানি কপালে ঠেকাইয়া বলিল—"আর দিদি, এমন ক'রে দিনকটা কাট্‌লেও যে বাঁচতুম, তাও পোড়া অদেষ্টে সইবে কি না, কে জানে।"

প্রস্রবণের ভিতর রুদ্ধ একরাশ জল যেন কাহার অদৃশ্য হস্তের তাড়নে ঝর ঝর করিয়া বহিয়া গেল।

দুঃখ-দৈন্যকে সঙ্গের সাথী করিয়াই সরলা এই পৃথিবীতে আসিয়াছিল। যখন সবেমাত্র তাহার তরুণ হৃদয়খানি যৌবনের মোহময় পুলকস্পর্শে মুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ই কাহার কঠিন অগ্নিহস্ত-স্পর্শে সব পুড়িয়া মরুভূমি হইয়া গেল। স্বামীর দান একটী পুত্রও ছিল না যাহাকে বুকে করিয়া এই মরুভূমির মধ্যেও সে মরূদ্যান রচনা করে। তারপর বিধবা সরলা এই দীর্ঘ পনেরো বৎসর কখনো দেবরের সংসারে, কখনো ভ্রাতার সংসারে দাসীবৃত্তি, পাচিকাবৃত্তি করিয়া কাটাইয়া আসিতেছে, বিনিময়ে পাইতেছে দু'টী অন্ন, উপকরণ তিরস্কার—লাঞ্ছনা। আজ এতদিন সে এই এক

তারামণি ছাড়া কখনও কাহারও নিকট হইতে একটী মিষ্ট কথা একটু সহানুভূতি লাভ করে নাই। তাই সে তারামণিকে ঝি বলিয়া ভাবিত না, বোধ হয় পারিতও না। তাহার দুঃখে সমবেদনা জানাইতে, 'আহা' বলিয়া একটু দরদ দেখাইতে এক তারামণি ছাড়া আর কেহ ছিল কি না, তাহাও সে জানিত না।

কার্ত্তিক মাসের প্রায় দশদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নে আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই বিশ্রাম লইতেছে, কেবল সরলা স্নান শেষ করিয়া এইমাত্র ভাতের থালাখানিতে হাত দিয়াছে, অকস্মাৎ পঙ্কজিনী রান্নাঘরে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, শীগ্‌গির একজন লোকের ভাত বেড়ে দাও না, ওনার কে একজন বন্ধু এসেছেন, শীগ্‌গির, বুঝলে।"

কথাগুলি শেষ করিতে করিতে ঝড়ো হাওয়ার মতন সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি চলিয়া গেল। একবার জানিবার প্রয়োজনও বোধ করিল না, তাহার এ আদেশটা ঠাকুরঝি কি ভাবে পালন করে।

সরলা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইয়া তাড়াতাড়ি অতিথির জন্য ভাতের থালাখানি বাড়িয়া দিল। আশ্চর্য্য না হওয়ার কারণ, ব্যাপারটা আজ কিছু নতুনই নয়!

মনের বেদনায় অতিমাত্রায় আহতা হইয়া সে নিজের ঘরখানিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে, এমন সময় তারামণি কোঁচড় ভরিয়া কতগুলি

ফল আনিয়া সরলার সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"কিছু মনে ক'রো না, দিদিমণি, এমন না খেয়ে না খেয়ে বাঁচবে কি ক'রে ভাই!"

অশ্রুজলে মুখখানি প্লাবিত করিয়া সরলা উত্তর দিল,—"বেঁচে আর কি হ'বে তারা দি', এমন ক'রে 'মহাপ্রাণীটা' বেরিয়ে গেলেও তো বুঝতুম।"

"কিন্তু ভাই, 'মহাপ্রাণীকে' এমন ক'রে কষ্ট দিলে কি সেটা পাতক হ'বে না?" তারামণি তাহাকে কাছে টানিয়া বসাইয়া ফলগুলি আগাইয়া দিয়া বলিল,—"দিদিমণি এ জন্মটা তো হা অন্ন, হা অন্ন, ক'রে কাটালে, আর জন্মটা যাতে আর সে কষ্টটা না পেতে হয় তার একটা উপায় কর না?"

অতিমাত্রায় বিস্মিতা হইয়া সরলা বলিল,—"কি পাগলের মত বক্‌ছিস্, তারা দি'!"

"না ভাই, সত্যি ব'লছি, ও পাড়ার বিশুখুড়ো, আরও কারা সব কাশী যাচ্ছেন, মা অন্নপূর্ণার অন্নকূট দেখতে। তাঁরাই বলছিলেন, সেই অন্নকূট দেখলে, দু'টা প্রসাদ মাথায় দিলে নাকি কখন অন্নকষ্ট হয় না, কোন জন্মেও না। তুমি যাও না দিদিমণি ওদের সঙ্গে, এ জন্মটা তো দুঃখে কষ্টে গেল, পরজন্মের একটা হিল্লে হ'য়ে থাকলে ক্ষেতিটে কি?"

কথাটা সরলাকে বেশ স্পর্শ করিয়া গেল।

২

কয়েকদিন ধরিয়া সরলা অনেক চিন্তা করিল। এদিকে ওপাড়ায় প্রায় অনেকে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত ; সময়ও নাই। সরলাও তাঁহাদের সঙ্গে কাশী যাইবার জন্য স্থির-নিশ্চয় করিল। সে কাশীযাত্রিদলের দলপতি বিশুখুড়োর নিকট হাজির হইয়া সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল ; সরলার একান্ত কাতর মিনতি বিশুখুড়ো অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "পেরে কি উঠ্‌বে মা, খরচ অনেক ; তা যাবে, বেশ তো !"

এতক্ষণ যাবার ইচ্ছাটাই তাহার হৃদয়ে দৃঢ় হইতেছিল, খরচের কথাটা একবারও মনে আসে নাই ; চিন্তাও করে নাই। কথাটা চিন্তা করিতে গিয়া বেচারী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল, পরে ভাবিল, দাদাকে বলি, কাঁদিয়া কাটিয়া খরচটা চাহিয়া লই, দেবেনই বা না কেন, সারাটা জীবন তাঁহার সংসারে দাসীবৃত্তি করিতেছি, আজ কয়েকটা টাকা তার বিনিময়ে খরচ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন ? না ! আশা তাহাকে মুগ্ধ করিল।

কিন্তু বলিতে গিয়া খরচ তো দূরের কথা, ভ্রাতা কঠোর উত্তরে জানাইয়া দিলেন, "যেখানেই যাবে একেবারের মত, এখানে আর ঠাঁই নেই, এটা ঠিক জেনে।" তবুও যাত্রার সঙ্কল্পটা তাহার মনের মধ্যে এমন প্রবল হইয়া তাড়না দিতে লাগিল যে, সেটা হইতে কেন্দ্রচ্যুত করিতে ভ্রাতার সে কথা কয়টা কিছুই নয়! সরলা খরচের কথাটা ভাবিতে বসিল। অকস্মাৎ আনন্দে, উৎসাহে তাহার চক্ষু দু'টী জ্বলিয়া উঠিল, দ্রুতপদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সে একটা পুঁটুলী খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ছোট একটী টিনের বাক্স বাহির করিল। ধীরে ধীরে বাক্সটীর মধ্য হইতে সরলা একটা সোণার নথ বাহির করিল। নথটী হাতে করিয়া সরলার চক্ষুদু'টী জলে ভরিয়া আসিল। এটা তাহার-মাতার শেষ স্মৃতি-চিহ্ন, এটাকে হাত-ছাড়া করিতে তাহার হৃদয়ে বড় বাজিয়া উঠিল, কিন্তু তবুও—

সে চুপি চুপি তারামণিকে ডাকিল,—হাতে নথটী দিয়া বলিল,—"এটা আমায় বেচে দিতে হ'বে তারাদি'।" কণ্ঠ তাহার কাঁপিয়া উঠিল, চোখে আঁচল দিয়া সে মুখ ফিরাইল।

তারামণি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নথটী হাতে তুলিয়া লইল।

৩

যাত্রিদলের সহিত সরলাও কাশী আসিয়াছে। নথটী বিক্রয় করিয়া সে যে কয়টী টাকা পাইয়াছিল, তাহাই তাহার একমাত্র সম্বল। কাশীতে তাহাদের এক এক করিয়া চারিদিন কাটিয়া গেল। সরলার মনের বাসনা একাগ্র হইয়া চোখে মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, সে ধ্যান করিয়া রাখিতেছিল শুধু একটী দিন।

দেওয়ালী। কাশী যেন সাজ সাজ রবে সাজিয়া উঠিতেছিল। আজ ভারতের নানা দেশের লোক কাশীধামে মিলিত হইয়াছে। দেওয়ালী হইতে তিনটী দিন পর্যান্ত মা অন্নপূর্ণার স্বর্ণমূর্ত্তি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। তাই বৎসরের এই তিনটী দিন, দর্শনার্থী হিন্দুর স্মরণীয়।

দেওয়ালীর দিন সন্ধ্যার সময় কাশীনগরী দীপালী সজ্জিত হইয়া যেন পৃথিবীর চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসি ছড়াইতে থাকে, সে
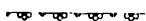
হাসিতে তেজ থাকে না—দীপ্তি থাকে, বিষাদ জাগে না—আনন্দ জাগে। দেওয়ালীর পরদিন অন্নকূট।

সরলারা কাশীতে যে বাড়ীখানায় আশ্রয় লইয়াছিল, সে বাড়ীর মালিক একজন যাত্রাওয়ালা। তিনি বৈকালে তাহাদের অন্নকূট দেখাইয়া লইয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সরলাও তাহাদের মধ্যে ছিল। মন্দির-পথ হইতে সেই বিরাট্ ভিড়, সেই উন্মত্ত জনস্রোত ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রতি নিঃশ্বাসটা বুকের মধ্যে চাপিয়া যে কেমন করিয়া সরলা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহা সে নিজেই অনুমান করিতে পারিল না। সেই জন-সমুদ্র দেখিয়া সরলা ভয়ে চক্ষু মুদিল। মন্দির-চত্বরে দাঁড়াইবার অবকাশটুকু পর্য্যন্ত পাইল না; সিঁড়ি বাহিয়া জনস্রোতের ধাক্কায় ধাক্কায় উপরে উঠিয়া, সে একেবারে মা'র সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মূর্ত্তির দিকে চক্ষু ফিরাইতেই একটা ঔজ্জ্বল্যের তেজে তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। সরলা ভক্তি-গদ্‌গদ-চিত্তে মা'র দীপ্তিচ্ছটা-প্রকাশিত মুখের দিকে চাহিয়া 'মা, মা,' বলিয়া নিমেষে প্রাণের সমস্ত কামনা, সুখ, দুঃখ ওই মাতৃ-মূর্ত্তির সম্মুখে নিবেদন করিয়া দিল। আর একটা মনুষ্যের ঢেউ তাহাকে একেবারে ছট্‌কাইয়া মন্দির বাহির করিয়া দিল। সে বাহিরে আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল ও পরে দলের সহিত মিলিত হইয়া সেইরূপ ধাক্কায় ধাক্কায় নীচে নামিতে নামিতে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল, দেখিল বিশ্বের সমস্ত আহার্য্য যেন এইখানে

একত্রিত করা হইয়াছে। একপাশে অন্নের বিরাট্ স্তূপ, তাহার দক্ষিণে বামে, উর্দ্ধে নিম্নে, আশে পাশে যে দিকেই চক্ষু ফিরান যায় কেবল মিষ্টান্নের স্তূপ, মায়ের অন্নদাময়ী নাম সার্থক করিয়া দিতেছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে, অথবা হয় নাই, চতুর্দ্দিক বৈদ্যুতিক আলোকে বিভাসিত হইয়া উঠিল। সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় একটা ভীষণ কল্লোলে সমস্ত ধ্বনিত হইতেছিল। সেই বিরাট্ অন্নস্তূপের একপাশে দাড়াইয়া একজন পাণ্ডা প্রসাদ বিলাইতেছিল। আজ যেন সমস্ত বিশ্ব বুভুক্ষিতের মত সেই প্রসাদ লইতে ছুটিয়াছে। সঙ্গীদের সঙ্গমুক্ত হইয়া সরলা সেই উন্মত্ত জনসঙ্ঘের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া চাপিয়া তুলিতেছিল, তবুও—ঐ আর একটু—আর একটু। সে সেই বিরাট্ অন্নস্তূপের নিকট দাঁড়াইয়া একমুষ্টি অন্ন আঁচল পাতিয়া ধরিল, বিলম্ব সহিল না, 'মা' বলিয়া সেই অন্নের একটা মুঠি যেমন মুখে দিয়াছে, অকস্মাৎ বিকট চীৎকার করিয়া একদল লোকের পায়ের নীচে সে চাপিয়া পড়িল। সে চীৎকার বুঝি বায়ুস্তরেও মিলাইতে পারিল না, শুধু সেই শব্দ-তরঙ্গের মধ্যেই ডুবিয়া গেল।

৪

চক্ষু মেলিয়া যখন সরলা চাহিল, দেখিল তাহার সঙ্গীরা সকলে ব্যাকুল হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে চক্ষু ঘুরাইয়া দেখিল এ তাহাদের সেই কাশীরই বাড়ী, যাহাতে তাহারা আসিয়া বাসা লইয়াছিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, মানুষের ভিড়ে সে চাপা পড়িয়াছিল, কিন্তু পাণ্ডাঠাকুর তাহাকে লোকের চাপের মধ্য হইতে অনেক কষ্টে উদ্ধার করেন। সরলার একে একে সব মনে পড়িল, সব দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে—ভাসিয়া উঠিল, সে চক্ষু মুদিল, দেখিল ভিতরটায় ঘোর অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়া মা'র সেই দীপ্তিময়ী মূর্ত্তিখানি যেন সহাস-দৃষ্টিতে তাহাকে অভয় দিতেছে। প্রায় একঘণ্টা পরে সরলা একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, হঠাৎ অঞ্চলের প্রান্তে দৃষ্টি পড়াতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া আবার মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। সকলেই উৎসুক হইয়া সহসা তাহার এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল। সরলা আঁচলের খুঁটখানি তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, তাহার পথের সম্বল টাকা কয়টা

অঞ্চল কাটিয়া কে লইয়া গিয়াছে। সঙ্গীরা সকলেই মমতামাখা একটা 'আহা' বলিয়া ক্ষান্ত হইল, কিন্তু কি করিলে সরলার এ দুঃখ লাঘব হয়, সে চেষ্টা করিতে কাহারও বড় একটা আগ্রহ দেখা গেল না, ঐ একটী 'আহা' কথাতেই সব যেন পর্য্যবসিত হইয়া গেল।

আজ সরলাদের বাড়ী রওনা হইবার দিন। সকলেই সরলাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "চল তো আমাদের সঙ্গে, ভয় কি ?"

সকলেই যার যা পুঁটলী পাঁটলা লইয়া প্রস্তুত হইল। সরলাও তাহার কাপড়খানি একখানা গামছায় বাঁধিয়া তাহাদের সঙ্গ লইল।

ষ্টেশনে আসিয়া সকলেই যে যার টিকিট কিনিয়া লইল, কিন্তু সরলার জন্য মাথা ঘামাইতে কাহারও চেষ্টা দেখা গেল না। সে বিশু-খুড়োর কাছে কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা আমার উপায়, আপনারা কি আমায় এখানে ফেলে যাবেন ?" তাহার কাতর মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া খুড়ো মহাশয় নস্যের ডিবাটী বাহির করিয়া বাম-হস্তে খানিকটা নস্য ঢালিয়া দক্ষিণহস্তের দু'টী অঙ্গুলি পূর্ণ করিয়া নস্য টিপটী নাকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন,—"তাই তো মা, অবস্থাটা তো দেখলে, কারু হাতে ফালতু পয়সা একটীও নেই।" তারপর নস্যের হাতটী ঝাড়িয়া, কাপড়ের খুঁটে নাকটী মুছিয়া বলিলেন, "তা—মা, চড়ে তো বস গাড়ীতে, আমরা রয়েছি, ভয় কি ! যদি এমন তেমন হয়, তখন নয় দেখা যাবে ! ওই গাড়ী এলো, এস এস।"

হুড়মুড় করিয়া গাড়ী আসিল, সকলেই চঞ্চল-ভাবে গাড়ীতে

উঠিতে ব্যস্ত হইল, বিশুখুড়ো ও অন্যান্য সকলে গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। তাহাদের 'ভয় নাই' এতবড় একটা আশ্বাসবাণীতেও সরলা গাড়ীতে উঠিতে সাহস করিল না, বুঝি পারিলও না। তাহার নয়নদ্বয় ভীতা হরিণীর মত চারিদিকে চঞ্চল হইয়া ফিরিতে লাগিল। "ওগো" —তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। গাড়ী ছাড়ে বড় দেরী নাই, সকলেই তাকে গাড়ীতে উঠিবার জন্য আহ্বান করিতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না, সে ষ্টেশনের গোলমালের মধ্যেও ভাবিতে লাগিল, তাই তো ভ্রাতার সংস্থারে তাহার স্থান নাই, এ সংসারে কোথাও বুঝি তার স্থান নাই, তাই বোধ হয় মা আমায় পথের সম্বল কাড়িয়া তাঁহার এই সৃষ্টিছাড়া কাশীর পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন; তবে তাই হোক মা তাই হোক, কাশীর পথের ধূলার মধ্যেই হতভাগীর এ দেহটা মিশিয়া ধূলি হইয়া যাক্। গাড়ী ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া প্লাট্‌ফরম্ ছাড়িতে লাগিল, সঙ্গীদের আহ্বান সেই শব্দে ডুবিয়া গেল। সে তখন এতখানি চিন্তায় মগ্ন যে কিছুতেই তাহার দৃষ্টি ছিল না, কিছু পরে তাকাইয়া দেখিল, গাড়ী ঐ দূরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে।

সরলা বদ্ধ-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পা দু'খানা ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল, থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ষ্টেশনের কঠিন পাথরের মেজের উপর সে দেহখানি এলাইয়া দিল।

৫

নিরাশ্রয়া সরলা সন্ধ্যার অন্ধকারে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইল। সে চারিদিকে চাহিয়া এতক্ষণে নিজেকে সত্যই আশ্রয়-হীনা মনে করিল। তার উপর এই দুর্দ্দান্ত সহরে তাহার প্রতিপদ অতি সঙ্কোচে অতি ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতেছিল। একজন বৃদ্ধ পথের লোকের কাছে পথ জানিয়া সরলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কুয়াসার শীতল স্পর্শ তাহার চোখে মুখে লাগিয়া তাহাকে জড়সড় করিয়া দিল। কার্ত্তিক মাসের সেই কুয়াসাভরা আকাশতলে খোলাঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া বসিয়া সরলা ভাবিতে লাগিল বুঝি,—তাহার অদৃষ্টের কথা। একে একে জীবন-অধ্যায়ের সব কয়টী পাতা উল্টাইয়া গেল, দেখিল—প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে শুধু দুঃখ, নৈরাশ্য, লাঞ্ছনা; অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস তাহার জন্য এই নির্ম্মম নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছে। শিবপুরীর চারিদিক হইতে উত্থিত শঙ্খ-ঘণ্টার মৃদু কম্পন তখনও মধ্যে মধ্যে বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া

বেড়াইতেছিল, তখনও আকাশ-প্রদীপের শিখাগুলি নাচিয়া নাচিয়া জ্বলিতেছিল। আর সরলাও আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত করিয়া সে জানাইতেছিল—হৃদয়ের যাতনা। এমন সময় মধুর অথচ কাতরতা মাখান ধ্বনিতে তাহার শ্রবণ-বিবরে কে খানিকটা সুধা ঢালিয়া দিয়া যেন তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া ডাকিয়া উঠিল,—"দিদি! তুমি ওখানে, আর আমি তোমার জন্যে সারা সহরটা খুঁজে বেড়িয়েছি, ওঠ দিদি, ওঠ, মা তোমার জন্যে বড় অস্থির হ'য়ে প'ড়েছেন।"

সরলা এই স্নেহের সম্বোধনে গলিয়া গিয়াছিল, মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যখন দু'টী কচি কচি হাত তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আবার ডাকিয়া উঠিল—'দিদি!' তখন সরলা সদ্যঃ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠার মতন বলিল,—"ভাই, তুমি যাকে দিদি মনে ক'রে ডাকছ, আমি তো সে দিদি নই!"

দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মৃদু আলোকে সরলা চাহিয়া দেখিল, একটী চৌদ্দ পনের বছরের বালক একমুখ বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা লইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। বালকটী ধীরে ধীরে তাহার হাত দু'খান সরলার কণ্ঠদেশ হইতে মুক্ত করিতে করিতে বলিল,—"কিন্তু দিদি আপনি এখানে ব'সে কাঁদছেন কেন?" বালকটীর কথায় সরলার দুঃখ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, বলিল,—"ভাই, কান্না ছাড়

আমার যে এ সংসারে আপনার আর কেউ নেই, থাকবার স্থানও নাই; তাই ব'সে ব'সে কাঁদছি, কান্না বই আর আমি কোথায় কি পাব ভাই—"

"কেউ নেই!" বালক অতি আগ্রহে বলিয়া উঠিল,—"কেউ নেই!"

আঁচলখানার এক খুঁটে চক্ষু মুছিয়া সরলা উত্তর দিল,—"না ভাই, কেউ নেই, কিছু নেই!" বালকটী তাহার কোলের কাছের দিকে ঘেঁসিয়া রসিয়া সরলার দুঃখ-দৈন্যের সব কথাটুকুন এক এক করিয়া আদায় করিয়া লইল, বলিল,—"কিন্তু দিদি, এখন তো এই যে আমি তোমার এক ভাই রয়েছি!"

সরলা কথাগুলি উপভোগ করিল, কহিল,—"আঃ ভাই, তুমি আজ আমার জীবনের দুঃখের বোঝা যেন অনেকখানি নামিয়ে দিলে! বেঁচে থাক ভাই আমার!"

"এখন চল তোমার ছোট ভাইয়ের বাড়ী, রাত অনেক হ'য়ে এল দিদি!"

সরলা অতিমাত্রায় বিস্মিত-দৃষ্টি বালকটীর দিকে ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল, যেন স্বর্গের করুণা-মণ্ডিত এক দেবকুমার তাহার মস্তকে করুণা বর্ষণ করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কিছুক্ষণ পরে মুগ্ধার মত বলিয়া উঠিল,—"এ কি তুমি বলছ ভাই!"

বালকটী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—"দিদি! তোমায়

আমি যখন 'দিদি' ব'লে ডেকেছি তখন তুমি আমার সত্যিই দিদি! সংসারে আমাদের কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু এক বুড়ো মা ছাড়া আমাদের যত্ন করতে কেউ নেই; একমাত্র যে আমায় স্নেহ দিয়ে ভুলিয়ে রাখত, সেই দিদিকে—গ্রহণের রাতে হারিয়েছি; স্নান করতে গিয়ে আর ফেরেনি, সে কি আর বেঁচে আছে? তবুও মন কি তা মানে দিদি, চারদিকে খোঁজ পাঠান হয়েছে, নিজে আমি কত খুঁজেছি। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরছি—শুনতে পেলুম, কে দু'জন বলাবলি ক'রে যাচ্ছিল যে, ঘাটে একটী স্ত্রীলোক ব'সে কাঁদছে! তাদের কথা শুনে ছুটে এসেছি, আমার সে দিদিকে না পেলেও আমি আর এক দিদি পেয়েছি! এস দিদি!"

এবার আর সরলা না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না, কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া একটী হাসির রেখা মুখে টানিয়া বালকটীকে বলিল,—"ভাই, তোমার দিদিকে আবার পাবে, সেই, তোমাকে যত্ন করবে।"

"বেশ তো দিদি, সে হবে আমার ছোটদিদি আর তুমি বড়-দিদি! এস, মা তোমায় পেলে অনেকখানি সান্ত্বনা পাবেন, আদর ক'রে কোলে নেবেন, এটা আমি বেশ জানি, আর জানি বলেই তোমায় আসতে বলতে সাহস করছি। এস!"

বালকের সঙ্গে সরলা না আসিয়া থাকিতে পারিল না, অতটা সরলতাকে ব্যথা দিতে সে কোন মতেই পারিতেছিল না, যদিও সে জানিত একজন অপরিচিতাকে কে আশ্রয় দেয়!

তবুও তাহাকে আসিতে হইল, বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সে বিস্ময়-চমকিত হইয়া বাড়ীর আসবাব-পত্র দেখিতে লাগিল। এমন সময় উপরের কক্ষ হইতে একটী বৃদ্ধা ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন,—"শশি, বাবা, বাছাকে আমার খুঁজে পেলি ?" শশিশেখর সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া মাতাকে শান্ত করিয়া সরলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বলিল,—"মা, আজ তুমি আমার আর এক দিদির মা।"

বৃদ্ধা অতি আগ্রহে আসিয়া তাঁহার হাতখানি সরলার একখানি হাতে রাখিয়া বলিলেন,—"এস মা আমার। আমি যে মেয়ে পাবার তরে পথ চেয়ে ছিলুম মা।"

সরলা বৃদ্ধাকে প্রণাম করিতে গিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চোখের জলের ভিতর নানা রঙের বর্ণ ভাসিয়া উঠিল, দেখিল, স্বয়ং অন্নপূর্ণা যেন হাসি হাসি মুখে তাহাকে কোলে লইতে আগুয়ান। তাঁহার অন্নকূট আজ সার্থক !

বৃদ্ধাকে নত হইয়া প্রণাম করিতে গিয়া সরলা তাঁহার পায়ের নীচে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মুক্তি

ঋণ পরিশোধের অন্য দ্বিতীয় উপায় ছিল না বলিয়া চেৎলার নিমাই চাটুয্যের ছোট দোকানখানি ও একটুখানি সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। এতখানি কষ্ট ও দারিদ্র্য নিমাই সহ্য করিতে পারিলেও তাহার পত্নী কিন্তু সহিল না। ছ'বছরের একটী কন্যা রাখিয়া অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ কষ্টের হাঁত এড়াইল।

এই চল্লিশ বছরের বুড়া হাড় ক'খানার উপর এ আঘাতটা এতই শক্তি লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল যে, নিমাইয়ের আর কিছু নতুন করিয়া করিবার মত উৎসাহ ছিল না, বুঝি সামর্থ্যেও কুলাইল না। চাকুরীর মত বিদ্যার অভাবে সে চেষ্টাও বৃথা। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে কন্যা মলিনাকে সঙ্গে লইয়া নিমাই দেশত্যাগ করিল।

পরিচিতের সংস্রবে আর থাকিবে না; এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সে শিবপুরের ভদ্রপল্লীর দূরে এক নিভৃত পাড়ায় বাস করিতে লাগিল।

অবস্থাবিপর্য্যয়ে নিমাই আজ ভিক্ষুক। প্রত্যহ প্রত্যুষে ঝুলিটী কাপড়ের আড়ালে লুকাইয়া, সে ভিক্ষায় বাহির হইত। বাড়ী ফিরিতে বারটা, কোন দিন বা একটা; বাড়ীর দুয়ারে পা দিয়াই নিমাই রোজ ডাকিয়া উঠিত, "মা, মনু!"

মলিনা ছুটিয়া পিতার হাত হইতে ভিক্ষার ঝুলিটী লইয়া মেজের উপর ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "এত দেরী করলে কেন বাবা?" নিমাই হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "খেয়েচ তো মা?"

আগের দিনের দু'টী করিয়া বাসিভাত মলিনার জন্য রাখা থাকিত।

২

এমন করিয়া চার বৎসর কাটিয়া গেল। এতখানি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণেও স্বাস্থ্যের একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা মলিনার সুগোল দেহ-খানিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। রূপকথা বর্ণিত রাজকন্যার মত সুন্দরী না হইলেও, সে কুরূপা ছিল না। এই এত ছোট বয়স হইতেই মলিনা সংসারের প্রত্যেক কাজটী, পিতার সেবা হইতে রন্ধনাদি, সমস্তই নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইল। কন্যার নিপুণতার বিপক্ষে তার ওজর আপত্তি নিষ্ফল জানিয়া নিমাই চুপ করিয়া থাকিল, আরামও যে একটু না পাইল তাহা নহে।

এতদিন পর্য্যন্ত এক পাড়ায় থাকিয়াও কোন প্রতিবাসীর সহিত নিমাইয়ের আলাপের সুযোগ হয় নাই, বা সে চেষ্টা সে করে নাই। সে থাকিত সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া। সে যে ভিক্ষুক। অনেকটা অভিমান এই অনুভবটার মধ্যে লুকান ছিল। কিন্তু তবুও প্রতিবেশী নবি শেখ তাহার মরমের দরদী হইয়া পড়িয়াছিল।

ভিন্ন জাতি এই লোকটীর বয়স নিমাইয়ের সমান। লোকে তাহাকে আধপাগলা বলিয়াই জানে। বিবাহ করে নাই, কাজ-কর্ম্মও কিছু করে না। সামান্য যা-কিছু 'ক্ষেতি' আছে ভাইরাই দেখে। এই আধপাগলা লোকটীর প্রধান বিশেষত্ব, সে কাহারও সহিত মেশে না, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী বিশেষত্ব, লোকের সহিত যত সে না মেশে, ছেলেদের সে তত বেশী পরিমাণে ভালবাসে। গাছ হইতে ফল পাড়িয়া ছেলেদের খাইতে দেয়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলিকে কাঁধে করিয়া বেড়াইয়া আনে। যখন ছেলেদের সঙ্গ না পায়, তখন একান্তে নির্জ্জনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

এতখানি নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়াও রোজ সন্ধ্যাবেলা সে নিমাইয়ের কাছটীতে একবার আসিয়া বসিত। দু'এক ছিলিম তামাক পোড়াইয়া চলিয়া যাইত।

৩

চৈত্রমাস। ঠিক এই সময়টা দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দিল। ভিক্ষা আর মেলে না। ক্রমাগত দিনকয়েক শাকসিদ্ধ খাইয়া নিমাইদের দিন কাটিল। নিজের জন্য যতটুকু চিন্তা না ছিল, মেয়েটার জন্য নিমাই চিন্তায় আকুল হইল। ভিক্ষা দেবে কে, তবুও নিমাই ভিক্ষায় বাহির হইল। প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে ঘুরিল, কিন্তু নিষ্ফল আবেদন কাহারও শ্রুতিস্পর্শ করিল না। অবসন্ন দেহে সে রাস্তার এক পাশে বসিয়া পড়িল।

* * * * *

বেলা শেষে নিমাই বাড়ী পৌঁছিয়া কতগুলি চাল, আলু ও আট আনার পয়সা মেজের উপর রাখিয়া দ্রুতপদে শয্যার আশ্রয় লইল। মলিনা পিতাকে শ্রান্ত মনে করিয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনাদির উদ্যোগ করিতে যাইবে, উন্মত্তের মত নিমাই শয্যা হইতে লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, "ও-গুলো রেঁধো না মা। আমি মিথ্যে কথা ব'লে ও-গুলো

এনেছি। কোন ভিখিরী ডেকে দিয়ে দাও। কাল আধপেটা খেয়েছ, আজকের দিনটা কি না খেয়ে থাকতে পারবে না মা?"

মলিনা স্তব্ধদৃষ্টিতে চাল ও পয়সাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন কোন্ ভোরে নিমাই বাহির হইয়া গিয়াছে। বেলা তখনো বেশী হয় নাই, নবি শেখ নিমাইয়ের বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল, "মা, মণি, উঠেচ মা?"

"হাঁ কাকা।" মলিনা বাহিরে আসিল।

নবি মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেল। তাহার কচি মুখখানির কাতরতা নবিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। সে বলিল, "এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? কাল বুঝি কিছু খাওনি মা?" নবি হাতে একটা পুঁটুলী লইয়া আসিয়াছিল। পুঁটুলীটা খুলিয়া কয়েকটা ফল মলিনার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই ফল কয়টা খেয়ে নে মা।"

মলিনা কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "কাল বাবারও যে কিছু খাওয়া হয়নি। তিনি যে আমার জন্যই কোন্ ভোরে বেরিয়েছেন। না কাকা, আমি ফল খেতে পারব না।"

মলিনা পিতার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে রৌদ্র জ্বলিয়া উঠিল। মলিনা ঠায় বসিয়া। কিন্তু সময় যতই দ্রুততালে অগ্রসর হইতে লাগিল, বালিকার মনও পিতার অমঙ্গল আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া পড়িল। সে আর স্থিরভাবে বসিয়া

না থাকিয়া নবি কাকার বাড়ীর দিকে ছুটিল। নবি দক্ষিণমুখ হইয়া দ্বারদেশে বসিয়াছিল। মলিনা কাতরকণ্ঠে 'কাকা' বলিয়া ডাকায় সে চম্‌কাইয়া ফিরিয়া চাহিল, বলিল, "দাদা এখনও ফেরেন নি ?"

"না কাকা, এত দেরী তো বাবার কোন দিন হয় না, কাল আবার সারাদিন কিছু খানও নি, কোন্ ভোরে উঠে বেরিয়েছেন।"

"বাড়ী যাও মা, আমি দেখ্‌ছি।" নবি দ্রুতপদে আঁতুলের দিকে চলিল। সে জানিত প্রকাশ্যপথে নিমাই ভিক্ষায় প্রায়ই বাহির হয় না, চলেও মাথা হেঁট করিয়া।

৪

তুলসীতলাটাই আমাদের হিন্দুঘরের মেয়েদের শোক দুঃখ অপনয়নের একমাত্র আশ্রয়স্থল। মলিনা নিজের কল্পনাটুকুর সাহায্যে তাহাদের কুঁড়েখানির পাশের তুলসী গাছটার তলায় বার বার মাথা ঠুকিয়া পিতার জন্য কত কি প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময় একখানা গরুর গাড়ী তাহাদের বাড়ীর পথে আসিয়া দাঁড়াইল। মলিনা ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, গাড়ীর ভিতর পিতা অবশ দেহে পড়িয়া আছেন। নবি শেখ গাড়ীখানার দাঁড় দু'টা কাঁধ হইতে নামাইয়া, নিমাইকে ধরিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিল। মলিনা কাঁদিয়া, কাঁপিয়া পিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। অতিকষ্টে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া নিমাই বলিল, "ভয় কি মা, ভগবান্ আছেন, একটু জল।"

মলিনা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া পিতার মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল। নবি বলিল, "চিকিৎসা চাই মা, দেরী করলে চলবে না। অত কাতর হ'য়ো না। ও-পাড়ায় ডাক্তার করুণাময় বাঁড়ুয্যে

থাকেন। বড় ভাল ডাক্তার, দয়াও তেমনি। তুমি তার কাছে না গেলে হবে না মা।”

মলিনা দ্রুতপদে বাহির হইতেই নবি বলিয়া উঠিল, “ও কাপড় প'রে বেরুতে পারবে না মা, একটা কিছু মুড়ি দিয়ে নাও।”

মলিনা একখানি ছিন্নভিন্ন র‍্যাপার গায়ে দিয়া ডাক্তারের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

বেলা প্রায় শেষ। করুণাময়বাবু তাঁহার বাটীসংলগ্ন ছোট বাগানখানিতে বসিয়া আছেন। সৌম্যমূর্ত্তি, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। গরম বলিয়া বাগানেই চেয়ার টেবিল আনাইয়া বসিয়াছেন। বিশ পঁচিশ জন রোগী উপস্থিত, দু'একখানা গাড়ীও তাঁহাকে লইবার জন্য হাজির।

ডাক্তারবাবু কি একটা লিখিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় মলিনা হাঁপাইতে হাঁপাইতে করুণাময়বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। কণ্ঠরুদ্ধ, তবুও ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “বাবার বড় অসুখ, নবি কাকা আপনার কাছে আসতে বল্লেন। চলুন আপনি, নইলে বাবা বাঁচবেন না।”

ডাক্তারবাবু এই করুণ ও সরল আবদার শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটী ম্লান মলিনবসনা সুন্দরী বালিকার এই আকুল আহ্বান। মলিনা আবার বলিল, “আমরা বড় গরীব, নবি কাকা, বাবা, আমি, আমাদের আর কেউ নেই।”

মলিনা কাঁদিয়া উঠিল। সস্নেহে বালিকার মাথায় হাত দিয়া করুণাময়বাবু বলিলেন, "আমি ডাক্তার, যাব না কেন মা ?"

"ডাক্তারকে যে পয়সা দিতে হয়, আমাদের যে একটীও পয়সা নেই।"

ডাক্তারবাবু সে কথা চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি জ্বর হয়েছে মা, এ গরমে গায়ে—"

মলিনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, আমার কাপড় যে—"

ডাক্তারবাবু চক্ষের জল সামলাইতে সামলাইতে উঠিয়া সকলকে বলিলেন, "আমি আসছি। চল মা।"

৫

নিমাই কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া করুণাময়বাবু হতাশ হইয়া পড়িলেন। শুনিলেন, আজ দু'দিন দু'জনেই প্রায় অনাহারী। কয়দিন ক্রমাগত কদন্ন ও শাকসিদ্ধ আহারেই এইরূপ ঘটিয়াছে।

ডাক্তারবাবু নবি ও মলিনাকে আবশ্যক মত উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন, "আবার আমি কাল সকালেই আসব।" পরে ঔষধের সঙ্গে কিছু খাদ্য-সামগ্রীও আনাইয়া দিলেন। অনেক করিয়া মলিনাকে কিছু খাওয়াইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

পরের দিন ভোর হইতেই করুণাময়বাবু আসিয়া নিমাইকে দেখিলেন। শিয়রের কাছটাতে বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছেন?"

নিমাই সকৃতজ্ঞ ভাবে করুণাময়বাবুর মুখের দিকে চক্ষুদু'টী ঘুরাইয়া একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া বলিল, "ভগবান্ যদি এতদিনে মুখ

তুলে চেয়েছেন, আমাকে আর বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না ডাক্তার-বাবু। এ দেহ অনেক আগেই যাওয়া প্রার্থনীয় ছিল। কি না করেছি, পেটের জন্য মিথ্যে কথা পর্য্যন্ত বলেছি, আরো যদি বাঁচতে হয়, চোর হ'তে হবে।"

করুণাময়বাবু তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন, "সময় মানুষকে নিয়ে এমনিই খেলায় নিমাইবাবু।"

—"কিন্তু আমায় নিয়ে বড় জবর খেলা খেলেচে ডাক্তারবাবু।" নিমাই এক এক করিয়া দুঃখের সব কাহিনী বলিয়া গেল। তাহার দুঃখের কাহিনী করুণাময়বাবুর হৃদয়কে গলাইয়া ফেলিল। মলিনা কাছেই বসিয়াছিল। অতি স্নেহে তাহার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া মমতায় গলিয়া বলিলেন, "বড্ড কষ্ট পেয়েছ, মা আমার।"

সন্ধ্যার সময় নিমাইয়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। মলিনা পিতার পা দু'খানার উপর মাথা রাখিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। সমস্ত দিন ছুটাছুটী করিয়া নবির তখনও আহার হয় নাই। ডাক্তারবাবু তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "এই চিঠিটা নিয়ে এখনি আমার ডিস্পেন্সারীতে যাও, দেখিয়ে ওষুধটা নিয়ে এস। দেরী না হয়।"

নবি গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া আগ্রহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন, ডাক্তারবাবু?" ডাক্তারবাবু কোন কথা বলিলেন না, চিন্তিত ভাবে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। ডাক্তার-

বাবুর নীরবতার অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া নবিকে আঘাত দিল। নবি কাঁদিতে জানিত না, আজ কিন্তু ছোট শিশুটীর মত কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "মা মণির তা হ'লে কি হবে ডাক্তারবাবু।"

"যাও দেরী ক'রো না।"

নবি সংযত হইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। করুণাময়-বাবু নবির গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই মুসলমান বৃদ্ধটীর কথা।

ডাক্তারবাবু নিমাইয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন বোধ কচ্ছেন ?"

মুখ দিয়া কথা ফুটিতে চাহিতেছিল না, ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাইয়া জড়িত স্বরে নিমাই বলিল, "বড় সুন্দর মরা, তবে এমন সুখের মরণেও আনন্দ নেই, মনুর কথা ভেবে। ওর কি হবে ?" নিমাই উত্তেজনাবশে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া, করুণাময়-বাবুর হাত দু'খানা জড়াইয়া ধরিলেন।

ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার কিছু চাইবার আছে আপনার কাছে নিমাইবাবু, আমার ছেলেটী এম্-এ পড়ে, তার জন্যে একটী পাত্রী খুঁজছিলেম, মলিনাকে আমায় দিন। এই আমার চিকিৎসার 'ফি'।"

—মুক্তি—

নিমাই ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে যোড়করে অশ্রুনেত্রে ভগবানের উদ্দেশে বলিল, "তোমার সব দয়াটা এই ভিক্ষুকের শেষ মুহূর্ত্তে ঢেলে দেবে ব'লে রেখেছিলে ?" মলিনাকে কাছে টানিয়া বলিলেন, "মা মনু, তোমাকে পিতৃহারা হ'তে হ'ল না, যাও দেবতার পায়ের ধূলো নিয়ে এস।"
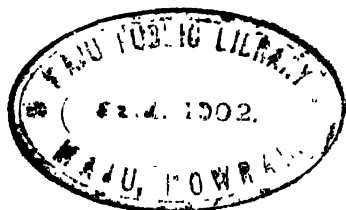
এক যাত্রায় পৃথক্ ফল

১

ক্লাসে সকলের চেয়ে বেশী বন্ধুত্ব আমার সন্তোষের সঙ্গে। আমাদের বাড়ীর পাশটীতে ছোট বাগিচাওয়ালা বাড়ীখানিতে সন্তোষরা থাক্‌ত। সন্তোষের বাবা কি কাজ কর্‌তেন আমি তা জান্‌তাম না, কোনদিন সন্তোষকে জিজ্ঞেসও করিনি। যখনই সন্তোষদের বাড়ীতে যেতাম, তার ছোট বোন মিনি আমায় 'দাদা' 'দাদা' ব'লে কাছটীতে ছুটে আস্‌ত, ছোট্ট বিলিতী কুকুরটা এসে পায়ের ওপর মাথা ঘসড়াত; আমার সত্যিই তা বড় ভাল লাগত। আর সব চেয়ে ভাল লাগত সন্তোষের মার স্নেহ, যত্ন। সন্তোষের বাবাও আমায় খুব ভালবাসতেন, যখনই আমায় দেখতেন আদর ক'রে কাছে ডেকে কত কি জিজ্ঞেস করতেন। এমনি ক'রে আমাদের শৈশব কেটে গেছে।

২

এখন আমি রেঙ্গুনে কোন আফিসে খুব মোটা মাইনেয় কাজ করি। সম্প্রতি স্বাস্থ্যটার সঙ্গে দেহ-মনের বনিবনা না হওয়ায় কিছুদিনের ছুটী নিয়ে একেবারে সুদূর পশ্চিমে কাশীতে এসে পড়লাম। প্রথম কটা দিন—আজ বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন, কাল দুর্গাবাড়ী, পরশু সারনাথ ইত্যাদি ইত্যাদি ঘুরে বেশ একরকম ছিলাম কিন্তু শেষে আর কিছু ভাল লাগছিল না।

সেদিন বিকালে আর কোথায়ও না গিয়ে ঘাটের ধারে বেড়াতে বেরুলাম। এ ঘাট সে ঘাট বেড়িয়ে ঘুরে কখন যে মণিকর্ণিকার ঘাটে এসে পড়েছি তা আমি মোটেই খেয়াল করতে পারিনি। ঝিকি-মিকি রৌদ্রের শেষ রেখাটুকু গঙ্গার নির্ম্মল সলিলের ওপর খেল্‌তে খেল্‌তে কখন যে পালিয়ে গিয়েছে আমায় তা জানতে দেয়নি; তবুও রৌদ্রের শেষ আভাটুকু এখনও গঙ্গার জলে লাল হ'য়ে ভাসছিল। আসন্ন সন্ধ্যার আঁধারে বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে বাড়ী

ফির্‌বো ফির্‌বো মনে কচ্ছি, হঠাৎ অদূরে একটা গাছের নীচে একজন গৈরিক বস্ত্রধারী ব্যক্তিকে দেখে মনে হ'তে লাগল, যেন চেনা। কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি—এ যে সন্তোষ! অবাক্ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম। বেশী দিনই বা কি, মোটে বছর কয়েক হ'ল আমি শুনে এসেছিলাম সন্তোষের বিয়ে। এমন কি ঠাট্টা ক'রে ব'লে এসেছিলাম পর্য্যন্ত, দেখিস্ ভাই, বিয়ে হ'লে আমাদের যেন ভূলে যাসনি। সে একটু মুচকে হেসেছিল মাত্র। আজ সে সন্ন্যাসী! আমার ভুল হয়নি ত! রুমালখানা পকেট থেকে বার ক'রে চোক দুটো রগড়ে আবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যই সন্তোষ! গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে সে তখন—

"দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন।"

গুন্ গুন্ ক'রে গান সুরু ক'রে দিয়েছে। সন্তোষের ভাব দেখে আমি 'হো' 'হো' ক'রে হেসে উঠলাম। সন্তোষ আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার গান গাইতে লাগল। আমার বড় অভিমান হ'ল! এতদিনের পর বন্ধুকে দেখে কোথায় আগ্রহভরে— কেমন আছ, বাড়ীর খবর, দেশের কথা জিজ্ঞেস ক'রে তাকে পাগল ক'রে তুলবে, না একেবারে সম্পূর্ণ উদাসীনভাব, যেন আমায় চেনেই না! আমি ধীরে ধীরে ডাকলাম, "সন্তোষ!"

—তাকে ত কাশীতে দেখতে পাচ্ছি না। সেই মণিকর্ণিকার ঘাটে কতবার খোঁজ করেছি কিন্তু দেখা ত হ'ল না। কেউ কোন খবর দিতেও পারে না। অবসাদের ওপর হতাশের এই নতুন ক্লান্তি নিয়ে সেই ঘাটেই ব'সে থাকতাম, ঠিক যেখানটীতে সন্তোষকে দেখেছি—চুপ ক'রে ব'সে থাকত!

রাতদিন ঐ জায়গায় ব'সে ব'সে সন্তোষের সেইদিনকার দেখা হওয়ার ও তার কাহিনী শোনার কথা মনে হ'ত। তার দুঃখের কথা সেদিন সে আমায় বলেছিল। তার দুঃখে কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তখন তার সঙ্গে হৃদয়কে এক করতে পারিনি ব'লে বুঝতে পেরেছিলাম না, যে মানুষের ছেলে বৌ মারা গেলে সন্ন্যাসী হবার সাধ কেন? আজ আমার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে আঘাত ক'রে কে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, যে ভালবাসার ধন এমন ক'রে হারিয়ে গেলে, তার আর সংসারে ভালবাসার কিছুই থাকে না!

কিন্তু একদিন একি হ'ল! আমি ঘাটে নেমে স্নান কচ্ছি, দেখলাম একটা নৌকা এসে ঘাটে লাগল। জনকতক বড়লোক নৌকা থেকে নেমে এসে, আমি যেখানে বসি সেইখানে গেল। অত লক্ষ্য করলাম না; কিন্তু একজনের গলার শব্দে চম্‌কে ফিরে তাকাতেই দেখি 'সন্তোষ'!

মস্ত ধনবানের মত আমার বসবার স্থানটী দেখিয়ে একজনকে বলছে, "এই এইখানে আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে বসেছিলাম। জায়গাটা

দেখলেই আমার আগের ছেলে বউয়ের জন্য এখনও মন কেমন ক'রে ওঠে।"

একজন ব'লে উঠ্‌লো, "থাক্‌, আর গত বিষয়ের আলোচনা ক'রে কি লাভ!"

ঘাটে ছু'টী স্ত্রীলোক স্নান করছিল। তাদের মধ্যে একজন বল্‌লেন, "এ বাবুরা কোথাকার?" অপরা উত্তর করিল, "চৌধুরী সাহেবের জামাই!"

শুনলাম—সন্তোষ কাশীর বিখ্যাত ধনবান্‌ রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের জামাই। চৌধুরী সাহেবকে আমি জানতাম। যখন এর আগে কাশীতে এসেছিলাম, তখন তাঁর খুব সুন্দরী একটী কন্যা আশালতার বিবাহের চেষ্টা হচ্ছিল। আমার মাথা ঘুরে উঠলো। যে সন্তোষের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমার প্রাণের মধ্যে হাহাকার ছুটছিল; আজ তার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখলাম। একবোঝা ব্যথা সন্তোষের কাছে হাল্কা করতে এসেছিলাম, কিন্তু তাকে সাম্‌নে পেয়ে কাশী ছেড়ে পালাবার ইচ্ছায় কি একবোঝা আরও নিয়ে চুপি চুপি ঘাট ছেড়ে উঠলাম। কানে গেল ওদেরই মধ্যে কে একজন যেন বলছে, "জামাইবাবু, এখানে আসলে যদি আপনার মন খারাপ হয় তো এখানে নাই বা এলেন, চ'লে আসুন!"

আমি তখন চিরকালের জন্য নিজেকে সন্তোষের কাছ থেকে

লুকিয়ে রাখার জন্য কাশী ছাড়ার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। কাজেই সেই কথায় সন্তোষ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল কি চ'লে গেল সে দেখার অবসর তখন আমার ছিল না।

শান্তি-জল

১

বৃদ্ধ রামপদ ঘোষের—দু'টী পুত্র। উপেন্দ্র ও নরেন্দ্র। উপেন্দ্র, নরেন্দ্র হইতে দুই বৎসরের বড়। ষোলোর কোঠায় পা দিতে না দিতে বৃদ্ধ উপেন্দ্রের বিবাহ দিয়া একটী ঘর আলোকরা বধূ ঘরে আনিলেন। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই উপেন্দ্রের উপর ষষ্ঠীদেবীর কৃপা হইল। বৃদ্ধ ঘোষজা আহ্লাদে আত্মহারা হইলেন।

উপেন্দ্র কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং তাহার সাংসারিক বুদ্ধিও বেশ পরিপক্ক ছিল; সুতরাং সে বিদেশে চাকুরী করিতে গেল। বৃদ্ধ ঘোষজা একবার বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র যখন বলিল, "বাবা নরেনের পড়াশুনা তো বিশেষ কিছু হ'ল না, আমি যেটুকু শিখেছি তার জোরে আমার খাবার পরবার বিশেষ কোন কষ্ট পেতে হবে না। আমাদের যা আছে তাতে

আমরা দু'ভায়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে যেতে পারি। তবুও দু'টো পয়সা ঘরে আসলে ক্ষতি কি? আর ব'সে ব'সে খেলে রাজার রাজত্ব ফুরিয়ে যায়, আমাদের কথা তো তুচ্ছ।" পুত্রের যুক্তিপূর্ণ কথায় বৃদ্ধ আর অমত করিল না।

উপেন্দ্র বিদেশে গেল, আর নরেন্দ্র দেশে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। বিশেষ লেখাপড়া না শিখিলেও নরেন্দ্র সংসার বেশ শৃঙ্খলার সহিতই চালাইতে লাগিল। নরেন্দ্রের বিবাহে নিতান্ত অমত থাকিলেও পিতা ও ভ্রাতার নিতান্ত আগ্রহে বিবাহ করিতে হইল। ঘোষজার সংসারটী এবার অনেকগুলি নবাগতের কোলাহলে ভরিয়া উঠিল। উপেনের ছেলেমেয়ে দু'টী ও নরেনের ছেলেটী বৃদ্ধ ঘোষজার কোলে পিঠে চড়িয়া মানুষ হইতে লাগিল। সুখে স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধের দিনগুলি কাটিয়া যাইত। ব্যাটার রোজগারে পায়ের উপর পা তুলিয়া জয়ঢাক বাজাইয়া যেদিন বৃদ্ধ আনন্দধামের যাত্রী হইল, তাহার পর হইতেই না জানি কেমন করিয়া এই আনন্দ-বাজারে আগুন লাগিয়া সমস্ত ওলট্ পালট্ করিয়া দিল।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইবামাত্রই চাকুরীস্থান হইতে ছুটী লইয়া উপেন্দ্র বাড়ী আসিল। নরেন্দ্র ছুটিয়া দাদার পায়ে লুটাইয়া পড়িল; দুই চক্ষের জলে দাদার চরণ সিক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "দাদা গো, বাবা আমাদের ছেড়ে গেছেন।"

চাদরের খুঁটে চক্ষু মুছিয়া উপেন্দ্র ছোট ভাইকে ভূমি হইতে

উঠাইয়া কোলে চাপিয়া ধরিলেন। কেহ কাহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না, দুইটী পবিত্র হৃদয়ের মৌন ভালবাসা দ্রব হইয়া উভয়কে শান্ত করিল।

"দাদা!"

"ভাই!"

"আমি যে সংসারের কিছুই জানিনে, আমার কি হবে দাদা!"

"তোর ভয় নেইরে ভাই, ভয় নেই!" অশ্রু ছাপাইয়া জল গড়াইয়া উপেন্দ্রের বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল, নরেন্দ্র দাদার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিল, তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

২

পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। উপেন্দ্রেরও ছুটী ফুরাইয়া আসিতে চলিল। ইহার মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে, কাজেই উপেন্দ্র ভাবিল, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ভাগ করিয়া তাহার অংশ নরেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইবে। রাত্রে আহার শেষ করিয়া বিছানায় আসিয়া বসিয়াছে, পত্নী ভবতারিণী দু'টী পানের খিলি আনিয়া স্বামীকে দিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। গমনে বাধা দিয়া উপেন্দ্র ডাকিল, "ওগো!"

স্বামীর ডাক শুনিয়া সম্মুখে ফিরিয়া পত্নী বলিল, "কেন গা?"

"শুনছো একটা কথা।"

"কি বল না।" উপেন্দ্র যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছিল স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিল, "কেমন বেশ হ'বে না! আমি তো বাইরে বাইরে থাকব, নরেন বিষয়-আশয় আগের মত দেখবে তাই এ ভেবে রেখেছি।"

পত্নী ভবতারিণীর এ যুক্তি ভাল লাগিল না। সে বলিল, "তা হ'লে কি ওরা আর কিছু রাখবে। সব উড়িয়ে পুড়িয়ে ব'সে থাকবে'খন।"

"না, না, নরেন আমার তেমন ভাই-ই নয়।"

ভবতারিণী মুখ ভার করিয়া বলিল, "তবে আমায় জিজ্ঞেসই বা কেন?"

উপেন্দ্র চুপ হইয়া গেল।

পরদিন গ্রামের দশজন মাতব্বর লোক ডাকিয়া উপেন্দ্র বলিল, "দেখুন আমি তো বিদেশে থাকব, দেশে থাকবে নরেন। তাই ভেবেছি বিষয় সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা ক'রে যাব। নরেন যাতে মনে করতে না পারে, দাদা তাকে কোন বিষয় ফাঁকি দিলে, সেই জন্যে আপনাদের ডেকেছি, আপনারা সামনে থেকে সব ঠিক ক'রে দিন।"

পাড়া প্রতিবেশীদিগের মধ্যে মাধব খুড়োই বিশেষ মাতব্বর ব্যক্তি। তিনি হুঁকায় খুব জোরে একটা টান দিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হুঁকাটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "সাধু, সাধু, উপেন তুমি ঘোষের উপযুক্ত ছেলে বটে! বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ বাবা, আজ কাল আর এমনটা শোনা যায় না, বেশ বেশ।" তাঁহার কথা সমর্থন করিয়া সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল।

"আপনি আমায় পর ক'রে দিচ্ছেন দাদা" বলিতে বলিতে নরেন্দ্র হেঁটমুখে দাদার পায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া একটা রুদ্ধ অশ্রু যেন বুক ফাটা ক্রন্দনে বাহির হইতে চাহিতেছিল। বাঁ-হাতে চক্ষু মুছিয়া সে আবার ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কি আপনার পায়ে কোন দোষ করেছি দাদা!" এবার আর অশ্রু বাধা মানিল না, টস্ টস্ করিয়া গলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

"এই এক পাগল, কাঁদ্‌ছিস কেন রে" বলিয়া আদরে তাহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া উপেন্দ্র বলিলেন, "বুঝতে তো পাচ্ছিস না ভাই, বিষয় সম্পত্তি বড় খারাপ জিনিষ, সেই জন্যেই একটা বন্দোবস্ত ক'রে নিচ্ছি। আর এ সমস্ত যে ভাই তোকেই দেখে শুনে চালাতে হ'বে, আমি তো আর এই নিয়ে ব'সে থাকতে পারব না।" এই একান্ত অনুগত ভাইটার বেদনা উপেন্দ্র বুঝিল, আর বুঝিল বলিয়াই বড় ব্যথিত হইল।

সমস্ত ভাগ হইয়া গেল কিন্তু একখানি বাগান ভাগ হইতে পারিল না; কারণ সেখানি ভাগ হইলে উহা হতশ্রী হইয়া যাইবে। নরেন্দ্র বলিল, "দাদা, ওটা অমনিই থাকতে দিন।" উপেন্দ্র অমত করিল না। সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে উপেন্দ্র বিদায় লইয়া সপরিবারে চাকুরীস্থানে চলিয়া গেল।

তারপর কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রের ছোট মেয়েটী ক্রমেই বড় হইয়া সম্প্রতি বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সেইজন্য কন্যার বিবাহের চেষ্টায় উপেন্দ্রকে আর একবার ছুটী লইয়া দেশে আসিতে হইল।

সেদিন ভাদ্রমাসের অপরাহ্ণে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গাছপালাগুলিকে ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিয়া বৃষ্টি থামিল। বর্ষণ-ক্ষান্ত আকাশের স্থানে স্থানে অনেকটা সিন্দূর রঙের বিকাশ হইয়া, সেখানি চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি পটের মতই ফুটিয়া উঠিল। পৃথিবীর এক কোণ হইতে রামধনুখানা ভাঙ্গা ধনুকের আধখানার মত আকাশের গায়ে কিছুদূর পর্য্যন্ত গা এলাইয়া পড়িয়া আছে।

ভবতারিণী তাহার ছোট ছেলেটীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের ছোট বাগানখানিতে বেড়াইতেছিল। ছোট ছেলে হরেন লাফাইয়া লাফাইয়া এ গাছের ফুল ও গাছের পাতা টানিয়া ছিঁড়িয়া একাকার করিতে লাগিল। কখন বা যেখানে ঝরা ফুলের মিষ্টগন্ধের আকর্ষণে প্রজাপতিগুলি তাহাদের চারি পাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের ধরিবার নিষ্ফল-প্রয়াসে এদিক্ সেদিক্ ছুটাছুটী করিতেছিল। বাগানের এক পাশে গোলাপ গাছে একটা বড় গোলাপ ফুটিয়াছিল। হরেনের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িয়া গেল। সে দৌড়িয়া মাতার কাপড় ধরিয়া টানিয়া বলিল, "মা! ঐ দেখ্ কেমন একটা লাল ফুল ফুটে আছে, তুলে দিবি চল্—চল্ মা।' হরেন মাতার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। ভবতারিণী হাসিয়া ফুলটি ছিঁড়িয়া তাহার হাতে

দিল। এমন সময় কোথা হইতে হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের ছেলে মাণিক আসিয়া হরেনের হাত হইতে ফুলটী কাড়িয়া লইল। হরেন কাঁদিয়া উঠিল।

ভবতারিণী ফিরিয়া ব্যাপারটী দেখিল এবং "কি দুষ্টু ছেলেরে বাবা" বলিয়া মাণিকের গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটা দুই চড় বসাইয়া ফুলটী কাড়িয়া হরেনের হাতে দিল। মাণিক কাঁদিতে কাঁদিতে মার নিকট নালিশ করিল, "মা! হরুদাদা আমার গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়েছে, আমি কেড়ে নিতে গেলাম, জ্যাঠাইমা আমায় চড় মেরে ফুল কেড়ে নিলে" বলিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

ছোট বধূ বিন্দুবাসিনী মেয়েটী নিতান্ত ভালমানুষ হইলেও ছেলেমেয়েদের মার-ধরটা মোটেই পছন্দ করিত না। মাণিকের গালে পাঁচ পাঁচটা আঙ্গুলের ফুলো ফুলো লাল দাগ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। পুত্রের হাত ধরিয়া একেবারে বাগানে আনিয়া বড়জা'কে ডাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ দিদি, এমনি মারই কি মাত্তে হয়, ছেলে মানুষ দু'জনেই, ও নয় একটা দোষই করেছিল।"

ভবতারিণী মুখখানি বাঁকারির ধনুকের মত বাঁকাইয়া বলিল, "হ্যাঁ ছোট বৌ, তোর আক্কেলখানা কি বল্ তো, তুই এলি কিনা আবার অমন ছেলের জন্যে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে, ধন্নি যা হ'ক!"

"তা দিদি, অমনিই হোক আর তেমনিই হোক, ছেলেপিলেদের মার-ধরটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।"

"তা আমাদের কাছে আসে কেন, ছেলেকে তোমার আটকে রাখলেই পার।"

"আসবে না কেন, বাগান তো কারও একলার নয় যে—"

বিন্দুর কথা আর শেষ হইতে পারিল না। ভবতারিণী বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "বাগান তোমার বাবা ক'রে দিয়ে যাননি।"

বিন্দুবাসিনী সর্পদষ্টের ন্যায় বিবর্ণমুখে ছেলের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা এখানে চাপা পড়িলেই ভাল হইত, কিন্তু তাহা হইল না। ভবতারিণী চোখের জলের সহিত ঘটনাটা স্বামীকে বুঝাইয়া দিল। কন্যার বিবাহের চেষ্টায় পরিশ্রান্ত উপেন্দ্রের মন সেদিনের বর্ণিত ঘটনায় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তখনই নরেন্দ্রকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব ব্যাপার কি শুনি ?"

সে বেচারা কিছুই জানে না সুতরাং দুই চার বার আমতা আমতা করিয়া বলিল, "কি হয়েছে দাদা !"

তাহার সম্পূর্ণ নির্লেপতার ভাব দেখিয়া উপেন্দ্র ক্রোধে বলিয়া ফেলিল, "আর ন্যাকামিতে কাজ নেই। বৌমার বাবা তো

বাগানখানি তাকে মৌরসী পাট্টা ক'রে দিয়ে যাননি, কালই বাগানের একটা বন্দোবস্ত ক'রে, তবে অন্য কাজ।"

দাদার কথায় বিরক্ত হইয়া নরেন্দ্র বলিল, "বেশ তো তা করবেন এখন, তা ব'লে যার তার বাপ তুলে কথা বলা কেন?" সে বাহির হইয়া নিজের ঘরে গিয়া স্ত্রীর মুখে সব ব্যাপার শুনিল।

৩

এই সামান্য কারণটাকে বড় করিয়া দু'ভায়ে নিজের জেদে বাগানের স্বত্ব লইয়া আদালতের আশ্রয় লইল। দুর্ব্বল-চিত্ত উপেন্দ্র প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-স্নেহের বন্ধন স্ত্রীর কথায় ছিন্ন করিল। যখন আদালতের কল্যাণে উভয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইল, তখন নরেন্দ্র চলিয়া গেল অন্য এক গ্রামে, আর উপেন্দ্র থাকিয়া গেল নিজের গ্রামে। এতখানি ভ্রাতৃ-বাৎসল্য যে কেমন করিয়া এমন হইয়া গেল, তাহা তাহারা নিজেরাও অনুভব করিতে পারিল না।

সংসারে মানুষ ভাবে এক, হয় আর। দুইটী পুত্র রাখিয়া বৃদ্ধ রামপদ ঘোষ সংসারের দেনা পাওনা বুঝাইবার জন্য যেদিন ভগবানের আস্তানায় গমন করেন, তাঁহার মনে অন্ততঃ এ আশা ছিল না যে, তাঁহার সাজান সংসারটী এত সহজে ধ্বংসের মুখে যাইবে।

মামলা উপলক্ষে উপেন্দ্র চাকুরীটী হারাইয়াছিল; সুতরাং

তাহাকে বাধ্য হইয়াই দেশে থাকিতে হইল। নরেন্দ্রের চেষ্টার গুণে সেই গ্রামের জমিদারের অধীনে সামান্য একটী চাকুরী যোগাড় হইয়া গেল ও তাহাতে সে এক প্রকার সুখেই দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু তবুও নরেন্দ্রের মন দাদার জন্য বড় ব্যাকুল ছিল। সে মাঝে মাঝে অনুতাপ করিয়া বলিত, "কেন সামান্য বিষয়ের জন্য পিতৃতুল্য দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিলাম।" এজন্য সে নিজেকে নিজের কাছে কুণ্ঠিত বোধ করিত এবং সে কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা দিবানিশি অনুভব করিতে লাগিল।

উপেন্দ্রও রাগটা কিছুদিন ঝালাইয়া রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে তাহার হৃদয়টা হাহাকার করিয়া উঠে। পিতার মৃত্যুকালে অসহায় ভাইটী যখন পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সেই সকরুণ মুখচ্ছবি উপেন্দ্রের মানসপটে মাঝে মাঝে উদয় হইত। তাহার সমস্ত হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন ডাকিতে চাহিতেছিল—"ওরে তুই আয় ভাই, আয়!" কিন্তু বদ্ধ একটা অভিমান তাহাদের মিলনকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। এমনি করিয়া একটা বছর ঘুরিতে চলিল।

আশ্বিন মাস। পূজার বড় দেরী নাই। শরতের নির্ম্মল আকাশে গো-বৎসের মত খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে; আর পাখীগুলি সেই নির্ম্মল নীল আকাশে ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া যাইতেছে। গ্রামের পর গ্রাম জুড়িয়া একটা অব্যক্ত

আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। ভোর বেলার শিশির-সিক্ত শিউলি ফুলের মিষ্ট গন্ধটুকু সারা গ্রামগুলিকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। ভিখারীরা দোর দোর ঘুরিয়া আনন্দের লহর তুলিয়া মার আগমনী গাহিয়া বেড়াইতেছে। পূজাবাড়ীর নহবৎগুলি মিষ্টস্বরে গাহিয়া গাহিয়া মার আগমনী সকলকে জানাইয়া দিতেছে। ছোট বড় ছেলে মেয়েরা নূতন লালপেড়ে কাপড় পরিয়া এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আজ ষষ্ঠী, কাল সপ্তমী, পরশ্ব অষ্টমী। এমন করিয়া বিজয়া আসিল। সেদিনও পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষুকরা করতালি বাজাইয়া "কোন্ প্রাণে উমায় আমার পাঠাব কৈলাসপুরী।" গান গাহিয়া ফিরিতেছে। নহবৎও পূর্ব্বস্বর ত্যাগ করিয়া বিজয়া গাহিয়া সারা গ্রামখানিকে বিষাদ-সাগরে ডুবাইতেছিল। একটা কিসের বিষাদ-ভরে সকলেই মৌন হইয়া রহিল, সঙ্গে সঙ্গে নির্জীবতাও দেখা দিল। তাহাদের তখন দেখিলে কে বলিবে যে দু'দিন আগে ইহারাই আনন্দে মগ্ন ছিল।

পূজার এত আনন্দের মধ্যেও দু'টী পরিবারে একটা খাপছাড়া ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। পূজায় সকলেই হাসে, তাহারাও হাসিয়াছে। কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ নাই। সে শুষ্ক হাসি আনন্দের পরিবর্ত্তে

বিষাদেরই সৃষ্টি করিয়াছে। একটা ব্যথিত মৌন বিষাদ তাহাদের সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়াছিল।

নরেন্দ্র দিন কয়েকের ছুটা লইয়া জীর্ণ পরিত্যক্ত বাটীখানিতে আসিয়াছে। মানুষের স্পর্শে বাড়ীখানি কেমন একটু লক্ষ্মী-শ্রী ধারণ করিয়াছে, মানুষের কোলাহলে বাড়ীখানি যেন সজীব হইয়াছে। সবই সেই, তবুও কিসের অভাব। নরেন্দ্র বুঝিল, কিসের অভাব। আজ তাহার প্রাণে দাদার অভাবটা একটা বড় অভাব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমনই সুখের কতদিন—সে সুখ, সে আনন্দ কতখানি পূর্ণতায় সে উপভোগ করিয়া আসিয়াছে। এবার এ পূজার আনন্দে অতটা পূর্ণ আনন্দ সে উপভোগ করিতে পারিল না। তাহার মন দাদার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল, কিন্তু মস্ত একটা অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইল—অভিমান।

বিকালে ভাসান দেখিয়া সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র বাড়ী ফিরিল। পরিচিত ব্যক্তিরা কেহ নমস্কার করিয়া গেল, কেহ কোলাকুলি করিয়া গেল, কেহ আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। এত বিষাদময় আনন্দের মধ্যেও তাহার মন কেবল দাদার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। সকলে আসিল, সকলে গেল। তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া দাদাও শিরোমণি মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলেন। নরেন্দ্র উদাস হইয়া পুতুলের মত বসিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল, "আমি ছোট ভাই, দাদা আমায় আশীর্ব্বাদ করিতে নাই আসিলেন,

আমি নিজে কেন দাদার আশীর্ব্বাদ লইয়া আসি না। দেবতার আশীর্ব্বাদ সে যে দেবতার কাছে মাগিয়া লইতে হয়।”

সন্ধ্যার অন্ধকারে সে লুকাইয়া দাদার বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে কে যেন সাড়া দিতেছিল,—ওরে সে যে দাদা, তোর তো অতটা অভিমান করিয়া থাকা ভাল নয়। ধীরে ধীরে বাগান পার হইয়া সে সদর দরজায় ঢুকিল। দুইটা ধাপ দিয়া পূর্ব্বদিকের দালানে উঠিতে হয়; সেইটাই ঘরে যাইবার পথ। উঠানে একটা পেয়ারা গাছ থাকায়, সেখানটা অন্ধকার। নরেন, একটু থমকিয়া দাঁড়াইল ও পরক্ষণেই সেই অন্ধকার পথে তাহার বেদনা-ভারাক্রান্ত দেহ লুটাইয়া দিল।

উপেনকেও আজিকার বিজয়া নির্দ্দয়ভাবে বিঁধিতেছিল, সে অন্যমনস্কভাবে বাড়ী ফিরিতেছিল, হঠাৎ নরেনের মাথায় পা পড়ায় চমকিয়া বলিল, “কে-ও?”

নরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দাদার পদধূলি লইতে লইতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “দাদা আমি নরেন,—আপনি যা দিতেন না, আমি তাই নিলাম—আমার অভিমানের সাজা। সে বড় কষ্ট দিয়েছে দাদা—” বলিতে বলিতে নরেন আর কান্না চাপিতে পারিল না—“আশীর্ব্বাদ করুন ছোট ভাই যেন ছোট ভাই-ই থাকে।”

উপেন এতক্ষণ কেবল নরেনের মাথায়, মুখে হাত বুলাইতে

বুলাইতে—"ভাইরে—ভাইরে আমার," মাত্র বলিতেছিলেন ও শিশুর মত কাঁদিতেছিলেন, তাঁহার আত্মপ্রকাশ করিবার মত কোন কথাই আসিতেছিল না। পরে নরেনকে তুলিয়া বক্ষঃসংলগ্ন করিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত বাগানখানির মধ্যে আনিলেন। সাদা মেঘের কোলে চন্দ্র মুখ ভাসাইলেন। একটা গাছের পাতার আড়াল হইতে তাহার হাসির জ্যোতিঃটুকু বাহির হইয়া নরেন্দ্রের মুখে চোখে ভাসিতে লাগিল। উপেন গাঢ়স্বরে বলিলেন, "ভাই তোকে যে বাবার শেষ দান ব'লে মাথা পেতে নিয়েছিলাম; আমি ম'রে যাব, তুই 'না' বলিসনে;—এই বাগান তোরও নয় আমারও নয়—আমার মাণিকের, এখন আয় ভাই" বলিয়া নরেনের হাত ধরিয়া টানিলেন।

দূরে বিজয়ার ভাসানের বাদ্য, বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গেল; চন্দ্রও আর একবার খুব জোরে মুখ তুলিয়া গাছের আড়ালের পার হইতে তাহাদের মস্তকে সুধাবর্ষণ করিয়া দিয়া দেখিয়া গেলেন, তাঁহারই কিরণস্পর্শে তাহাদের অশ্রুজল পবিত্র শান্তিজল-রূপেই মুক্তার মত জ্বল জ্বল করিয়া ভাসিতেছে।